

# বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

## অষ্টম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে  
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

---

# বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

## রচনা

ড. সুমন কাণ্ডি বড়ুয়া

গীতাঞ্জলি বড়ুয়া

ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া

উত্তরা চৌধুরী

## সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া

---

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৬-৭০, মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমন্বয়ক

মোঃ জিয়াউল হক

আলেয়া আজার

কম্পিউটার কম্পোজ

পারফর্ম কলার গ্রাফিক্স (প্রাঃ) লি:

প্রবন্ধ

সুদর্শন বাছার

সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন

মোঃ হাসানুল কবীর দোহাণ

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

---

মুদ্রণে:

## প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বোত্তম উন্নয়নের পূর্বশর্ত। অর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশীকৃত জনশক্তি। জায়া আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অতর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারণ ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিদ্যেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্মাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সত্যস্বকৃত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের বৃদ্ধক-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের গ্রন্থ সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুরে শিখনফল মুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঞ্জিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিভিন্ন কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সন্মোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

**বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা** পাঠ্যপুস্তক কটি শ্রেণি উপযোগী বিষয় ও অধ্যা সমৃদ্ধ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠনে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিষয়বস্তুভিত্তিক চিত্র সন্নিবেশ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই পাঠ্যপুস্তক পাঠ করে ধর্ম ও নৈতিকতার আদর্শ গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হবে। মানুষ মানুষে ভেদাভেদ জুড়ে গিয়ে সদচরণ, সর্বজীবের দয়া ও সংযমশীল অনুসরণে আগ্রহী হবে। সৌতম বুদ্ধের উপদেশ ভূদয়জ্ঞান করে শিক্ষার্থীরা সং ও আদর্শবিত্ত জীবন গঠনে উদ্যুত হবে।

একবিংশ শতকের অলৌকিক ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তক কটি রচিত হয়েছে। কাজেই পাঠ্যপুস্তক কটির অর ও সমৃদ্ধিশাধনের জন্য যে কোনো পঠনকূলক ও মুক্তিসজ্ঞাত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের বিশূল কর্মকাজের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে পুস্তক কটি রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংকল্পপনুলাতে পাঠ্যপুস্তক কটিকে আরও সুন্দর, শোভন ও হ্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানাননীতি।

পাঠ্যপুস্তক কটি রচনা, সম্পাদনা, ডিজাইন, নকুনা প্রুদ্রাি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে বরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তক কটি শিক্ষার্থীদের অনন্যিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

## সূচিপত্র

| অধ্যায়  | অধ্যায়ের শিরোনাম                           | পৃষ্ঠা  |
|----------|---|---------|
| প্রথম    | গৌতমবুদ্ধের সামানীতি                        | ১-৮     |
| দ্বিতীয় | বন্দনা                                      | ৯-১৮    |
| তৃতীয়   | নীল   | ১৯-২৮   |
| চতুর্থ   | দান   | ২৯-৩৭   |
| পঞ্চম    | সূত্র ও নীতিগাথা                            | ৩৮-৪৮   |
| ষষ্ঠ     | পারমী                                       | ৪৯-৬০   |
| সপ্তম    | ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও উৎসব                | ৬১-৭৩   |
| অষ্টম    | চরিতমালা                                    | ৭৪-৮৫   |
| নবম      | জাতক  | ৮৬-১০১  |
| দশম      | বৌদ্ধ তীর্থস্থান                            | ১০২-১১২ |
| একাদশ    | বৌদ্ধধর্মে রাজন্যবর্ণের অবদান: সত্কাটি কণিক | ১১৩-১১৯ |

## প্রথম অধ্যায়

# গৌতম বুদ্ধের সাম্যনীতি

গৌতম বুদ্ধকে সাম্যনীতির প্রবক্তা বলা হয়। সাম্যনীতি শব্দটি ‘সাম্য’ ও ‘নীতি’ শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। সাম্যনীতি বলতে বৈষম্যহীনতা, ন্যায় বিচার, মৌলিক অধিকার, পারস্পরিক মর্যাদাবোধ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা বোঝায়। সাম্যনীতি হচ্ছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য নীতি যার মাধ্যমে সর্বপ্রকার বৈষম্য দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বুদ্ধের ধর্মে এ নীতির বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। বুদ্ধ তাঁর সংঘ পরিচালনায়ও সাম্যনীতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ তিনি বুদ্ধের পেরেছিলেন, ন্যায় বিচার ব্যতীত শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তিনি সাম্যনীতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে বিরাজমান বৈষম্যগুলো দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন। এ অধ্যায়ে আমরা গৌতম বুদ্ধের সাম্যনীতি সম্পর্কে পড়ব।

### এ অধ্যায় শেষে আমরা -

- \* গৌতম বুদ্ধের সাম্যনীতি বর্ণনা করতে পারব ;
- \* পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বুদ্ধের সাম্যনীতির প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।

## পাঠ : ১

### বুদ্ধের সাম্যনীতি

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গৌতম বুদ্ধ হিমালয়ের পাদদেশে অসিলাবট্ট নামক রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। পর্যটন বছর বয়সে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর থেকে তিনি বুদ্ধ নামে অভিহিত হন। তিনি সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধর্ম প্রচার করে আশি বছর বয়সে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

তাঁর সময়কালে সমাজ জীবনে জাতিভেদ প্রথা ও বর্ণ বৈষম্য চরম আকার ধারণ করেছিল। এ সামাজিক বৈষম্যগুলো দূর করার জন্য তিনি তাঁর ধর্মে সাম্যনীতিকে অগ্রাধিকার দেন। বৌদ্ধধর্ম মতে, সাম্যনীতি হচ্ছে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মৌলিক ভিত্তি। সকল প্রকার দুঃখ, বৈষম্য, অগ্ন্যায়, অবিচার, ঘৃণা, সংঘাত প্রভৃতি বিদূরিত করার প্রধান অস্ত্র হচ্ছে সাম্যনীতি। তাই সমাজে সাম্যনীতির প্রয়োগ অপরিহার্য। সাম্যনীতির কারণেই বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের সীমারেখা অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত হয়েছে। এ জন্য কেমনো মুখ বা রক্তপাত ঘটেনি। বুদ্ধের সাম্যনীতি মানুষকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিক্ষা দেয়। অপরের অতিমত ও দুর্মতিভাজির প্রতি সহিষ্ণু হতে শেখায়। জাতি, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল বৈষম্য ও বিভাজন বিদূরিত করে মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে। এ আদর্শকে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে বুদ্ধ প্রথমেই তিসুসঙ্গ প্রতিষ্ঠায় সাম্যনীতির প্রয়োগ করেন। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংঘে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষকে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ মহাপ্রজ্ঞা (মহাপ্রজ্ঞা) বিশাখা নির্মিত স্তম্ভস্তরী পূর্বরাতে অবস্থান করার সময় তিসুসঙ্গকে উপলক্ষ করে বলেন, ‘তিসুসঙ্গ! গজা, ঘনুনা, অচিরবাতী, সন্ন্যাসী ইত্যাদি নদী সমুদ্রে মিলিত হয়ে তাদের

সত্ত্ব সত্ত্বা ও নাম হারিয়ে ফেলে, তেমনি কন্ডিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূত্র আমার ধর্মে প্রবেশ করে জাতি, গোত্র ও নাম হারিয়ে ফেলে। এখানে সকল মানুষ সমান।’

উপরের বাণী থেকে বোঝা যায়, বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ সকল পেশাজীবী মানুষের জন্য উন্মুক্ত। এখানে উল্লেখ্য যে, বুদ্ধের সময়কালে সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রবল ছিল। তখন চণ্ডাল, মেখর, মুচি প্রভৃতি পেশায় নিয়োজিতদের নিম্নবর্ণ হিসেবে অভিহিত করা হতো। এরা অস্পৃশ্য ছিল এবং অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করত। তারা সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারত না। ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের অধিকার হতে বঞ্চিত ছিল। তারা দ্বি-বিত ছিল এবং অন্যরা তাদের স্পর্শ থেকে দূরে থাকত। কিন্তু বুদ্ধশিষ্য ভিক্ষু আনন্দ চণ্ডাল কন্যার হাত থেকে পানি পান করে সেই সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করেন। এমন কি বুদ্ধ বৈশালীর বারবিতা অম্রপালির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে সমাজে তার মানবিক অবস্থানকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সুত্রনিপাত গ্রন্থের বসল সূত্র পাঠে জানা যায় যে, ‘মাতঙ্গ ছিল অন্তঃসূত্রে এক চণ্ডাল পুত্র। পরবর্তীতে প্রজ্ঞাজ্য গ্রহণ করে সকল প্রকার গোত্রে মেঘ-মৌহ, তৃক্ষা ও কামরূপ পরিভ্রাম করে শীল, সমাধি প্রজ্ঞা অমূল্যসম্পদকে দুর্গত শ্রেষ্ঠ কীর্তি অর্হত ফল প্রাপ্ত হন। তখন তাঁর সেবা ও পরিচর্যা করার জন্য অনেক ব্রাহ্মণ ও কন্ডিয় পুত্র নিয়োজিত হয়েছিলেন।’ এ সূত্রে আরো উল্লেখ আছে যে, কন্ডিয় ও ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেও অনেকে পাণ্ডকার্যে লিপ্ত থাকত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আধ্যাত্মিকতায় কিংবা অর্হত বা নির্বাণ লাভের জন্য জাতি, গোত্র, বর্ণ যেমন প্রতিবন্ধক নয় তেমনি সহায়কও নয়। কুশল-অকুশল কর্মই মানুষের পরিচয় নির্ধারণ করে। সুত্রনিপাত গ্রন্থের ‘বসল সূত্রে’ বুদ্ধ বলেছেন,

ন জজ্ঞা বসলো হেতি, ন জজ্ঞা হেতি ব্রাহ্মণো

কম্বুনা বসলো হেতি, কম্বুনা হেতি ব্রাহ্মণো।।

অর্থ্যে জন্মের দ্বারা কেউ বসল বা চণ্ডাল হন না, তেমনি জন্মের দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হন না। কর্মের দ্বারা চণ্ডাল হয়, কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হন।

ধর্মপদ গ্রন্থের ব্রাহ্মণ বর্ণেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন :

ন জটাহি ন গোত্রেহি ন জজ্ঞা হেতি ব্রাহ্মণো

যম্হি সচ্চক্ষ ধম্মোত সো সুচি সো চ ব্রাহ্মণো।।

অর্থ্যে জটীর দ্বারা, গোত্রের দ্বারা এবং জাতি দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। বরং যিনি সন্ধ্য পরিজ্ঞাত হয়েছেন তিনিই পবিত্র এবং তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

বাসেট্ট সূত্রে বুদ্ধ এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন, ‘জাতি হিসেবে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। ব্রাহ্মণ, কন্ডিয়, বৈশ্য, শূদ্রের পদচিহ্ন একই বৃণ। হাতি, ঘোড়া, বাঘ এব্ণ চতুষ্পদ প্রাণীদের মতো মানুষে মানুষে দৈহিক গঠনে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। প্রাণীদের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ, বর্ণ, শারীরিক গঠন, লোম, চক্ষু প্রভৃতিতে পার্থক্য আছে। মানুষে মানুষে তেমন পার্থক্য দেখা যায় না।’ স্কলত, জীবনের হসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, বুদ্ধিমত্তা, বিচারশক্তি, আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে মানুষে মানুষে অথবা জাতিতে জাতিতে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

বুদ্ধের সময়কালে কন্যা সন্তানের জন্ম কাহা ছিল না। সংযুক্ত নিকায়ের কোসল সংযুক্ত পাঠে জানা যায় যে, রাজমহিষী মল্লিকাদেবী কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন শুনে কোশলরাজ প্রসেনজিত বুঝে বিমর্ষ হয়ে পড়েন। বুদ্ধ জানতে পেরে রাজসমীপে উপস্থিত হয়ে রাজা প্রসেনজিতকে বললেন, 'কন্যা সন্তানের জন্ম হেতু কারও দুঃখ পাওয়া উচিত না; কন্যা যদি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, ধর্মপ্রাণ, সংসারের প্রতি দায়িত্বশীল হয়, তাহলে কন্যা সন্তান পুত্রোৎপাদক শ্রেয়সী হবার যোগ্যতা রাখে। এমনকি এই কন্যা সন্তান রত্নগর্ভও হতে পারে। তার গর্ভজাত সন্তান ভবিষ্যতে মহৎ কার্য সম্পন্ন করতে পারে এবং সুবিশাল রাজ্যের অধিশূর হতে পারে।' বুদ্ধের বাণী শুনে রাজা প্রসেনজিত কন্যা সন্তানের জন্মকে শূন্য বলে মনে নেন।

বুদ্ধের সময়কালে গ্রন্থ অনেক ধরনের বৈষম্য প্রচলিত ছিল। বুদ্ধ সাম্যনীতির মাধ্যমে তথাকথিত সামাজিক বৈষম্যগুলো দূরীভূত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অন্যদিকাল থেকেই মানুষ সমাজে সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে আসছে। বুদ্ধই প্রথম সমাজে সাম্যনীতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিশু শাস্তি প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন।

### অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধের সাম্যনীতির শিক্ষা কী?

কীসের দ্বারা মানুষের পরিচয় নির্ধারিত হয়?

পাঠ : ২

## বুদ্ধের সাম্যনীতির প্রয়োগ

বুদ্ধের সমকালীন সমাজে নিম্নশ্রেণির মানুষের তেমন কোনো সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার ছিল না। বুদ্ধ অবহেলিত নিম্নশ্রেণির মানুষকে তার প্রতিষ্ঠিত চিন্তাসমাজে প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন। সে সময়ে সমাজে নিম্নশ্রেণির মানুষের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, ধর্ম ও অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষার বিধি-নিষেধ ছিল। বুদ্ধ সমাজ প্রবেশের সুযোগ করে দিয়ে ধর্ম ও বিদ্যা চর্চায় তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। নিচে প্রাসঙ্গিক একটি কাহিনী বর্ণনা করা হলো :

বুদ্ধের সময়কালে রাজগৃহের একপ্রান্তে এক অস্পৃশ্য দরিদ্র খাডর (মেথর) পরিবার বাস করত। সেই পরিবারে সুনীত নামক এক ছেলে ছিল। বড় হয়ে সেও জাতের পেশা গ্রহণ করে। রাজপথ ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করা, ময়লা-আবর্জনা নগরের বাইরে নিক্ষেপ করা প্রভৃতি ছিল তার নিত্য কাজ। এ কাজে কট্টকি ও তিরস্কার ছিল তার নিত্য পাতলা। অস্পৃশ্য বলে ভাঙ্খিয়া, অবহেলা ও অন্যায়ের তার দিন কাটিত। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে সে প্লানিময় জীবনের কথা ভাবত।

একদিন সে বুদ্ধভর্তি আবর্জনা নিয়ে পথ চলছিল। তখন সে পথে সশিষ্য বুদ্ধ নগরে আসছিলেন। বুদ্ধ কাছাকাছি এলে সে আবর্জনার ঝড়ি নামিয়ে সকলের হোঁচর এড়িয়ে কুষ্ঠিতভাবে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল।



মনে মনে ভাবছিল, আহা ! আমি যদি ভগবান বুদ্ধের পদতলে ঠাঁই পেতাম ! বুদ্ধ তার মনোবাসনা জানতে পেরে তার সামনে এসে মৈত্রীময়্য দৃষ্টিতে তাকালেন। বুদ্ধ তার মাথায় হাত রেখে বললেন, এসো সুনীত ! আমার সঙ্গে বিহারে চলো। সুনীত কিম্বা হতবাক হলো। সে ভাবল, ‘আমি রক্তা রক্তা কান্দুকার, সবার অকাজার পাত্র। কিন্তু সর্বজন পূজ্য ভগবান বুদ্ধ আমাকে স্পর্শ করে স্নেহজড়িত কর্তে আহ্বান করলেন।’ সে অবৈপ-বিহবল হয়ে বুদ্ধের চরণে লুটিয়ে পড়ল। অতঃপর বুদ্ধ তাকে বিহারে নিয়ে দীক্ষা দেন এবং তিক্ষুসঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। সংঘে প্রবেশ করে অল্পকালের মধ্যে সুনীত সর্ব অসক্তি ক্ষয় করে অর্হন্ত লাভ করেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে এবূপ আরো অনেক কাহিনী পাওয়া যায়, যা থেকে জানা যায় যে, সুনীতের মতো অনেকে বুদ্ধের সঙ্গে প্রবেশ করে মেধার প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হন। যেমন, উপালী ছিলেন নাসিতপুত্র। তিনি সঙ্গে প্রবেশ করে বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য পরিণত হন এবং বিনয়ে পারদর্শীতা অর্জন করে ‘বিনয়বর’ উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি বিনয় সম্পর্কিত বুদ্ধের সকল দেশনা স্মৃতিতে ধারণ করে রেখেছিলেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তিনি প্রথম মহাসঙ্ঘীতিতে বুদ্ধ দেশিত বিনয়সমূহ আবৃত্তি করেন, যা বিনয় পিটকে সংকলিত আছে। অনুবুপ কুল স্বর্ষির ছিলেন কৃষক। ‘কৃষ স্বর্ষির’ ছিলেন মালীর পুত্র। ‘হিরণ্যক স্বর্ষির’ ছিলেন এক চোরের পুত্র। ‘হদ্দ’ বা ‘হৃদক’ ছিলেন দাসীর পুত্র। গণিকা অহ্রোপাদির পুত্র ছিলেন ‘বিমল স্বর্ষির’। এ ধরনের আরো অনেক সাধারণ ঘরের মানুষ বুদ্ধের শিষ্য হয়ে কর্ম গুণে যশ, খ্যাতি এবং গৌরব লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এভাবে বুদ্ধ সকল পেশার লোককে সঙ্গে প্রবেশ ও ধর্ম চর্চার অধিকার দিয়ে মনুষ্যকূলের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন। জন্ম ও জীবিকার কারণে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার প্রচলিত প্রথা বুদ্ধ মিথ্যা প্রতিপদ করেন।



বিভিন্ন বংশ হতে আগত তিক্ষুগণ একত্রে ধর্ম শ্রবণ করছেন

জাতিভেদ প্রথা ও বর্ণবৈষম্য বিলোপ সাধনের অনেক উদাহরণ বৃন্দেবর জীবনচরিতে পাওয়া যায়। বৃন্দেবর ধর্মে সর্বত্র রোগ মানুষ স্থান লাভ করেছে। তাঁদের মধ্যে কুপ্ত স্ববির ছিলেন কৃষক। বর্ষ স্ববির ছিলেন মালীর পুত্র। হিরণ্যক স্ববির ছিলেন এক চোরের পুত্র। ছদ্ম বা ছন্দক ছিলেন দাসীর পুত্র। গণিকা অশ্রুপালির পুত্র ছিলেন বিমল স্ববির। এ ধরনের আরো অনেক সাধারণ ঘরের মানুষ বৃন্দেবর শিষ্য হয়ে বর্ষ, ষাতি এবং গৌরব লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বৃন্দেবর সময়কালে নারী সম্ভ্রান্ত হয়ে বা স্বাধীনভাবে ধর্ম ও বিদ্যা চর্চা করতে পারতেন না। বৃন্দেবর ভিক্ষুগীসকল প্রতিষ্ঠা করে ধর্ম ও শাস্ত্র অধ্যয়নে নারীদের সুযোগ করে দেন। ত্রিপিটকে, বিশেষত খেরীপাখা গ্রন্থে অনেক নারীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা ধর্ম ও বিদ্যা চর্চায় পরদশীতা ও সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। খেরীপাখা পাঠে জানা যায় যে, সুমঞ্জলির মা সংসারের অভাব-অনটন এবং দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ধ্যান সাধনা করেন। এতে তিনি তার মনের রিপুসমূহ সংযত করে অর্হত ফল লাভ করেন। বৈশালী নগরীর গণিকার কন্যা বিমলা একদিন মৌদগল্যায়ন স্ববিরের উপদেশে ভিক্ষুণী হন। পরে তিনি কঠোরভাবে সাধনার মাধ্যমে অর্হত ফল লাভ করেন। এভাবে ব্যাসের মেয়ে টালা, শ্রেষ্ঠী অনাথপিতিকের দাসী পূর্ণিঙ্গ, স্বর্ষকায়ের কন্যা শূভা, দরিত্র পরিবারের মেয়ে কৃশা গৌতমী বৃন্দেবর ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গভীর সাধনার মধ্য দিয়ে অর্হত ফল লাভ করতে সক্ষম হন। তাছাড়া তাঁর ধর্মে রাজা, মহারাজা, রানি, রাজকন্যা, শ্রেষ্ঠী কন্যাও স্থান পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে শাক্যরাজ শুম্ভোদনের মহিষী মহাপ্রজাপতি গৌতমী, মহারাজ বিম্বিসারের রানি ফেমা, কোশলের মহারাজার বোন সুমনা অন্যতম। ভিক্ষুগীদের মধ্যে অনেকেই ধর্ম ও দর্শন চর্চায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ধর্ম বেশনায়, বিনয়কর্ম সম্পাদনে এবং শাস্ত্র অধ্যয়নে তাঁরা ভিক্ষুদের সমকক্ষ হতে পেরেছিলেন। ভিক্ষুগী সন্ত প্রতীষ্ঠার সময় বৃন্দেবর আনন্দকে বলেছিলেন, 'হে আনন্দ! পুরুষের ন্যায় নারীরাও শ্রামণ্যকলের অধিকারী হতে পারে।' তিনি আরো বলেন, 'নারীরা উচ্চতর শ্রামণ্যকল লাভের যোগ্য এবং ফেমা, উৎপলবর্ণী, ধর্মদিনা, ভদ্রকপিলানীর ন্যায় ভিক্ষুগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আমার প্রবর্তিত শাসনের মঞ্জল ব্যতীত অমঞ্জল হবে না।' বৃন্দেবর এ বাণীতে ধর্ম ও বিদ্যা চর্চায় নারীরা পুরুষের সমকক্ষ তা স্বীকৃত হয়েছে।

### অনুশীলনমূলক কাজ

উপালীর উপাধি কী ছিল? তিনি স্মৃতিতে কী ধারণ করে রাখতেন?

কতিপয় বৃন্দেবর শিষ্যের নাম লেখ যারা বিভিন্ন পেশা থেকে প্রব্রজ্যপ্রহণ করে ষাতিতামন হয়েছিলেন।

ভিক্ষুগীসকল প্রতিষ্ঠার সময় বৃন্দেবর আনন্দকে কী বলেছিলেন?

## পাঠ : ৩

## বৌদ্ধ সাম্যনীতির সামাজিক প্রভাব

সমাজ জীবনে বুদ্ধের সাম্যনীতির অশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধের সময়কালে তথাকথিত নিম্নবর্ণ হিসেবে সমাজে যারা অবহেলিত, নিপৃহীত, নিষ্পেষিত ও ঘৃণিত ছিল তারা বুদ্ধের সাম্যনীতির প্রভাবে আত্ম-মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার প্রেরণা লাভ করেছিল। বুদ্ধের সাম্যনীতি প্রমাণ করেছে যে, পেশাগত দক্ষতা ও মেধার মাধ্যমে সমাজে যে কেউ প্রতিষ্ঠা ও সুখ্যাতি লাভ করতে পারে। এই সত্যটি উপলব্ধি করে সেদিন জন্মগত কারণে অবহেলিত মানুষগুলো কর্মের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। বুদ্ধের সাম্যনীতির ফলে ধর্ম ও বিনয় চর্চায় নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং নারীদের মুক্ত চিন্তার দ্বার উন্মোচিত হয়।

বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটেও বুদ্ধের সাম্যনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বুদ্ধের সাম্যনীতি অনুশীলনের মাধ্যমে :

- ১। জাতিগত বিবেচনাদূর করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।
- ২। সকলের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা যেতে পারে।
- ৩। পরধর্ম ও পরমতের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের মনোভাব সৃষ্টি করা যেতে পারে।
- ৪। পেশা ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।
- ৫। নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করে সমান সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।
- ৬। ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।
- ৭। পরিবার থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সকল বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণ করা যেতে পারে।

## অনুশীলনমূলক কাজ

শ্রেণিকক্ষে তুমি কীভাবে সাম্যনীতি প্রয়োগ করতে পার লেখ

## অনুশীলনী

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সৌতমবুস্প সবার আগে কাকে নীক্ষা নেন ?

ক. যশ স্ববিরকে

খ. বিমল স্ববিরকে

গ. উপালীকে

ঘ. হিরণ্যক স্ববিরকে

২। সামনীতি প্রয়োগের ফলে –

- i. সকলের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা যেতে পারে।
- ii. পেশা ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।
- iii. শত্রু শত্রুকে বিনাশ করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- |            |                |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii  | খ. ii ও iii    |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদ পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বর্ণালী ও মৌনিতা সিংহ এস.এস.সি পরীক্ষার্থী। এক বিয়ের অনুষ্ঠানে বর্ণালীর জরাজীর্ণ পোশাক-পরিচ্ছল নিয়ে মৌনিতা তিরস্কার করে। কিন্তু বর্ণালী এতে রাগ অভিমান না করে নীরবে সহ্য করে। পরীক্ষার ফলাফলে বর্ণালী জিপিএ-৫ এবং মৌনিতা বি শ্রেষ্ঠ পেয়ে পাস করে। বর্ণালী ভালো ফলাফলে মৌনিতার মনে নাড়া দেয়।

৩। মৌনিতা সিংহের আচরণে বুদ্ধের কোন শিক্ষা লক্ষিত হয়েছে?

- |               |             |
|---------------|-------------|
| ক. সহনশীলতা   | খ. সাম্যের  |
| গ. সহমর্মিতার | ঘ. শ্রম্ভার |

৪। উক্ত নীতি অনুসরণে মৌনিতা সিংহের আচরণিক পরিবর্তন ঘটবে –

- i. কাউকে ছোট করে না দেখা
- ii. অভিজাত্যে গর্ববোধ করা
- iii. পরস্পরিক দৌহার্য্য বৃদ্ধি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- |            |                |
|------------|----------------|
| ক. i       | খ. ii ও iii    |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

**সৃজনশীল প্রশ্ন :**

- ১। প্রবী বীসা একজন কম্পিউটার বিজ্ঞানী। শিক্ষা জীবনের পাঁচজন বান্ধবীও কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু তাদের সাথে মতবিরোধ দেখা দেয়ার প্রবী অন্যত্র গিয়ে কঠোর পরিশ্রম ও গবেষণার দ্বারা মনুস কম্পিউটার প্রোগ্রাম আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। পরে নিজ এলাকায় একটি কম্পিউটার ক্লাব গঠন করেন। তারপর তিনি অবহেলিত জেলে-মেয়েদের কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া, তাঁর ক্লাবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে কম্পিউটার বিষয়ে জ্ঞান আহরণের সুযোগ করে দেন। এতে তাঁর উদ্ভাবিত কম্পিউটার বিষয়ক জ্ঞান চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

- ক. গৌতমবুদ্ধ সঙ্গে কোন নীতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন ?  
 খ. ভিক্ষুদ্বীপে বৌদ্ধধর্মের কী ভূমিকা রেখেছিলেন ? ব্যাখ্যা কর।  
 গ. প্রবী ঝাঁসার কর্মকাণ্ডে বুদ্ধের সামান্যতির কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. তুমি কী মনে কর প্রবী ঝাঁসার জীবনে বুদ্ধের সাম্য নীতির শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২। কৌশিক এক গরীব পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। সে অত্যন্ত মেধাবী ছিল। তার পুণে মৃত্যু হয়ে সমাজের সম্ভ্রম ব্যক্তি পুলিন বড়ুয়া কৌশিকের দেখাপড়ার ভার গ্রহণ করেন। দেখাপড়া শেষ করে কৌশিক চাকুরিতে উচ্চ পদে যোগদান করে। তারপর কৌশিক ধনীপরিবারে নির্বিশেষে সকল জেলে-মেয়েকে শিক্ষার সুযোগ দানের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে।

- ক. শ্রাবস্তীর পূর্ণায়াম বিহার কে নির্মাণ করেন ?  
 খ. বুদ্ধ নারীদের সম অধিকার দিয়েছিলেন কেন ? ব্যাখ্যা কর।  
 গ. পুলিন বড়ুয়ার কর্মকাণ্ডটি বুদ্ধের সামান্যতির প্রতিফলন- ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. ‘জন্ম নয় কর্মের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন হয়’ - এ বাক্যটি কৌশিকের জীবনে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে - সামান্যতির আলোকে বিশ্লেষণ কর।

#### শূন্যস্থান পূরণ :

১. গৌতম বুদ্ধকে . . . প্রবক্তা বলা হয়।
২. সাম্যনীতি হচ্ছে . . . প্রতিষ্ঠার মৌলিক ভিত্তি।
৩. কুশল-অকুশল . . . মানুষের পরিচয় নির্ধারণ করে।
৪. পুরুষের ন্যায় . . . শ্রামণ্যফলের অধিকারী হতে পারে।
৫. সকলের . . . নিশ্চিত করা হতে পারে।

#### সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ‘সাম্যনীতি’ বলতে কী বোঝায় ?
২. বুদ্ধ বঙ্গ সুত্তে কী উপদেশ দিয়েছিলেন?
৩. কে ‘বিনয়ধর্ম’ উপাধিতে অভিষিক্ত হয়েছিলেন ? কেন ?

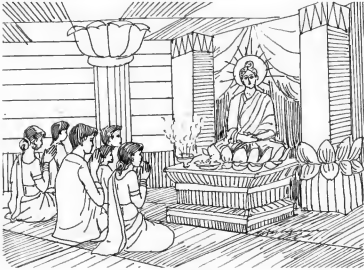
#### রচনামূলক প্রশ্ন :

১. বুদ্ধের সাম্যনীতি সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান কর।
২. বৌদ্ধ সাম্যনীতির সামাজিক প্রভাব আলোচনা কর।
৩. সাম্যনীতি বিষয়ক কাহিনীটি তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### বন্দনা

বুদ্ধ, ধর্ম এবং সত্যকে ত্রিরত্ন বলা হয়। বৌদ্ধরা বন্দনার মাধ্যমে ত্রিরত্নের গুণগুণি স্মরণ করে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করে। পূর্বের অধ্যায়ে আমরা ছোট পাখায় বর্ণিত ত্রিরত্ন বন্দনাটি পাঠ করেছি। এ অধ্যায়ে আমরা বুদ্ধের নয়গুণ, ধর্মের ছয়গুণ এবং সত্ত্বের নয়গুণ সমন্বিত ত্রিরত্ন বন্দনাটি পড়ব। এ বন্দনাটি খুবই সুপরিচিত। বৌদ্ধরা সাধারণত সকাল-বিকাল দু'বেলা গৃহে বাথাসনের সামনে বা বিহারে গিয়ে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও উৎসবে এ ত্রিরত্ন বন্দনাটি আবৃত্তি করে থাকে।



ত্রিরত্ন বন্দনারত উপাসক-উপাসিকা

#### এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- \* ত্রিরত্ন বন্দনার গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারব ;
- \* ত্রিরত্ন বন্দনা বাংলা অর্থসহ পাঁচি ভাষায় বলতে পারব ;
- \* ত্রিরত্ন বন্দনার সুফল ব্যাখ্যা করতে পারব।

## পাঠ : ১

## ত্রিরত্ন বন্দনা ও নিয়মাবলি

বুদ্ধ, ধর্ম এবং সত্ত্বের গুণরাশি স্মরণ করে যে বন্দনা করা হয় তাকে ত্রিরত্ন বন্দনা বলে। বিভিন্নভাবে ত্রিরত্নের গুণরাশি বর্ণনা করে ত্রিরত্ন বন্দনা করা হয়। ফলে বিভিন্ন রকম ত্রিরত্ন বন্দনা পাওয়া যায়। কোনো ত্রিরত্ন বন্দনা ছোট, কোনটি মধ্যম সারির, আবার কোনোটি বড়। এসব বন্দনায় ত্রিরত্নে অসীম গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রিরত্নের এসব মহৎ গুণাবলি স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত করাই ত্রিরত্ন বন্দনার মূল উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন নিয়মাবলি অনুসরণ করে ত্রিরত্ন বন্দনা করতে হয়। নিচে ত্রিরত্ন বন্দনার নিয়মাবলিসমূহ তুলে ধরা হলো :

১. ভালো করে মুখ-হাত ধুয়ে নিতে হয়। প্রয়োজনবোধে স্নানও করা যায়।
২. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করতে হয়।
৩. মনকে সমাহিত ও শোভ-শেষ-মোহ মুক্ত রাখতে হয়।
৪. হাঁটু ভেঙে করজোড়ে বসে বন্দনা করতে হয়।

## অনুশীলনমূলক কাজ

ত্রিরত্ন বন্দনার নিয়মাবলি বর্ণনা কর

## পাঠ : ২

## ত্রিরত্নের গুণাবলি

ত্রিরত্নের গুণাবলি অপরিমিত। কিন্তু এ অধ্যায়ে বর্ণিত ত্রিরত্ন বন্দনায় বুদ্ধের নয়গুণ, ধর্মের ছয়গুণ এবং সত্ত্বের নয়গুণের কথা বলা হয়েছে। এসব গুণ বুদ্ধের চেয়েও অধিক মূল্যবান। নিচে এসব গুণ বর্ণনা করা হলো :

## বুদ্ধগুণ :

বুদ্ধের নয়গুণ। যথা :

১. তিনি অর্হৎ। 'অরি' শব্দের অর্থ শত্রু। শোভ, শেষ, মোহ, অজ্ঞানতা, অহঙ্কার, মিথ্যাদৃষ্টি, সন্দেহ, আলস্য, মনের অস্থিরতা, লজ্জাহীনতা ও পাপভয়হীনতা প্রভৃতি অরিকে হত বা বিনাশ করেছেন বলে তিনি অর্হৎ। পুনর্জন্মের কারণ ধ্বংস করেছেন বিধায় আর জন্মগ্রহণ করে দুঃখ ভোগ করবেন না। এ কারণে তিনি অর্হৎ।
২. তিনি সম্যক সম্বুদ্ধ। কারণ তিনি জ্ঞান সকল ধর্ম ও সকল বিষয় সম্যকরূপে জেনেছেন এবং সম্যকরূপে দেশনাও করেছেন।

৩. তিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন। কারণ তিনি অষ্টবিদ্যা এবং পনের প্রকার আচরণ সম্পন্ন। অষ্টবিদ্যা হচ্ছে: বিদর্শন জ্ঞান, মনোময় ঋষি, ঋষিশক্তি, দিব্যশ্রোত্র জ্ঞান, পনের চিত্র সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া, পূর্বজন্ম বা নিবাস স্মরণ করার জ্ঞান, চুড়ি-উৎপত্তি জ্ঞান এবং কাম তৃষ্ণাক্ষয় জ্ঞান। পনের প্রকার আচরণ হচ্ছে: শীল, ইন্দ্রিয় সংযম, অহংরের মাত্রা জ্ঞান, সর্বদা সজাগ থেকে আত্মব্রত, শ্রদ্ধা, লজ্জা, পাপভয়, শ্রুতি বা পণ্ডিত্য, উৎসাহ, স্মৃতি, প্রজ্ঞা, প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান এবং চতুর্থ ধ্যান প্রভৃতি আচরণ সম্পন্ন।
৪. তিনি সুগত। তিনি পরম শান্তিময় নির্বাণ গত বা উপনীত হয়েছেন বলে সুগত।
৫. তিনি লোকজ। সমস্ত লোকের (ঋণ, মর্ত্য এবং পাতাল) বিষয় বিদিত বলে তিনি লোকবিদু বা লোকজ।
৬. তিনি অনুত্তর। কারণ নির্বাণ ধর্মে তিনি ব্যতীত অন্যকোনো শিক্ষক নেই। শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন গুণে তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ ছিলেন না বা তাঁর সমানও কেউ ছিলেন না বলে তিনি অনুত্তর গুণ সম্পন্ন।
৭. পুরুষদম্য সারথী। সারথী যেমন অদম্য অশুকে দমন করে তেমনি বুদ্ধ অদম্য, দুর্বিনীত, কাম ক্রোধাদি বশত উগ্রস্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে দমনপূর্বক শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত এবং নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম বা পালঙ্ক্য বলে তিনি পুরুষদম্য সারথী।
৮. তিনি দেব ও মনুষ্যগণের শাস্ত্রী। কারণ তিনি পরম সত্য দ্বারা অনুশাসন করেন এবং দেবতা ও মনুষ্যদের ধর্মোপদেশ দিয়ে নির্বাণ লাভ করান।
৯. তিনি বুদ্ধ-ভগবান। জানার যত বিষয় আছে তা অবগত হয়েছেন এবং অবগত হয়ে অন্যকে দেশনা করেছেন বলে তিনি বুদ্ধ। অগ্নিসদৃশ রাগ-দ্বেষ, মোহ ধ্বংস করে ভক্সমুখে আগমন-নির্গমনে পথ বুদ্ধ করেছেন বলে তিনি ভগবান।

### ধর্মগুণ :

ধর্মের ছয়গুণ। যথা :

১. এই ধর্ম সুব্যব্যাত বা সুপ্রকাশিত।
২. এই ধর্ম স্বয়ং স্রষ্টব্য বা নিজে নিজে দেখার যোগ্য।
৩. এই ধর্ম কালাকাল বিহীন। যখনই এ ধর্ম পালন করা হয় তখনই ফল পাওয়া যায়।
৪. এই ধর্ম এসে দেখা বা নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা যোগ্য।
৫. এ ধর্ম নির্বাণ প্রাপক অর্থাৎ নির্বাণে উপনীত করে।
৬. এই ধর্ম বিজগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ও জ্ঞাতব্য।



**সজ্জ গুণ :**

সজ্জের নরগুণ। যথা :

১. বুদ্ধের শ্রাবকসজ্জ সুপ্রতিপন্ন অর্থাৎ সত্যপথের অনুসারী। তাঁরা এ পথ অবলম্বন করে নির্বাণাভিমুখে গমন করছেন। তাই ভিক্ষুসংঘ সুপ্রতিপন্ন।
২. বুদ্ধের শ্রাবকসজ্জ ষাট্ঠ প্রতিপন্ন। অর্থাৎ অষ্টাঙ্গিক মার্গ নির্বাণ লাভের সোজা বা ষাট্ঠপথ। বুদ্ধের শ্রাবকসজ্জ এ পথে চলেছেন। তাই তাঁরা ষাট্ঠ প্রতিপন্ন।
৩. বুদ্ধের শ্রাবকসজ্জ নায়্য প্রতিপন্ন। বুদ্ধ নির্দেশিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ নির্বাণ লাভের সঠিক বা যথার্থ পথ। বুদ্ধশিষ্যাগণ এই পথ অনুসরণ করেন বলে তাঁরা নায়্য প্রতিপন্ন।
৪. বুদ্ধের শ্রাবকসজ্জ সমীচীন বা উত্তমভাবে প্রতিপন্ন। অর্থাৎ অষ্টাঙ্গিক মার্গ নির্বাণ লাভের উপযুক্ত বা উত্তম পথ। বুদ্ধের শ্রাবকসজ্জ এ পথে পরিচালিত বলে তা সমীচীনভাবে প্রতিপন্ন।
৫. বুদ্ধের শ্রাবকসজ্জ আহবানের যোগ্য। চারিপ্রত্যয় অর্থাৎ চীবর, পিণ্ড, শয়নাসন ও ঔষধ পঞ্চাদি দান দেয়ার উপযুক্ত পাত্র। এদের দান দিলে মহাফল লাভ হয়।
৬. বুদ্ধের শ্রাবকসজ্জ পাত্ৰুনেয়। 'পাত্ৰুন' শব্দের অর্থ দূরদেশ হতে আগত জাতি-মিত্রগণের সংস্কারের জন্য সংগৃহীত বস্তু। বুদ্ধের শ্রাবকসজ্জ এরূপ বস্তু দান ও গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র।
৭. বুদ্ধের শ্রাবকসজ্জ দক্ষিণা বা দানের যোগ্য।
৮. বুদ্ধের শ্রাবকসজ্জ অজ্জলিবল্লভ হয়ে অতিবাচনযোগ্য।
৯. বুদ্ধের শ্রাবকসজ্জ অনুরক্ত বা শ্রেষ্ঠ পুষ্যক্ষেত্র। উর্বর ভূমিতে যেমন শস্য ভালো হয়, তেমনি উপযুক্ত পাত্র দান দিলে অধিক পুষ্য অর্জন করা যায়। বুদ্ধের শ্রাবক শিষ্যকে দান দিলে অধিক পুষ্য অর্জন হয়। কারণ তাঁর লোভ-দ্বেষ-মোহ বিহীন এবং সর্ব আসক্তি মুক্ত।



ত্রিপুর বন্দনরত উপাসক-উপাসিকা

অনুশীলনমূলক কাজ  
 অর্হৎ কেন বলা হয়?  
 বুদ্ধ্যকে কেন পুরুষ দম্য সাবধী বলা হয়?  
 পাত্ৰন শব্দের অর্থ কী?  
 বুদ্ধ্যের শ্রাবকসমূহকে কেন অনুত্তর পুণ্যখেত্র বলা হয়?

পঠ : ৩

### ত্রিরঙ্গ বন্দনা (পালি ও বাংলা)

**বুদ্ধ্যের নয় গুণ বন্দনা (পালি)**

ইতিপি নো ভগবা অরহং, সম্মাসম্মুখো, বিজ্ঞাচরণ সম্পন্নো, সুগতো, লোকবিসু, অনুত্তরো পুরিসদম্ম সারথি,  
 সম্বা দেবমনুসসানং বুদ্ধ্যো ভগবাতি ।

বুদ্ধ্যং জীবিতং পরিযত্তং সরণং পছামি।  
 যে চ বুদ্ধ্যা অতীতা চ যে চ বুদ্ধ্যা অনাগতা,  
 পূস্পদ্ভা চ যে বুদ্ধ্যা অহং বন্দামি সৰ্বদা।  
 নন্তি মে সরণং অঙ্কুশং বুদ্ধ্যো মে সরণং বরং,  
 এতেন সুচবজ্জেন হোতু মে জয়মজ্জলং।  
 উত্তমজ্জোন বদেনহং পাদপংসু ববুত্তমং,  
 বুদ্ধ্যে যো বলিতো দোসো বুদ্ধ্যো ঋতু তং মমং।

**বাংলা অনুবাদ :**

ইনি সেই ভগবান, যিনি অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও আচরণ সম্পন্ন, সুগত (সুপথ অনুসারী), লোকজ্ঞ, দেব-  
 প্রজ্ঞা-নর-যজ্ঞ, তির্যক প্রভৃতির অদম্য পুরুষ দমনকারী সর্বশ্রেষ্ঠ সারথি, দেব এবং মানুষের শিক্ষক, বুদ্ধ্য এবং  
 ভগবান নামে অভিহিত।

আমি সারাজীবন বুদ্ধ্যের শরণ গ্রহণ করছি।

অতীত, অনাগত এবং বর্তমান বুদ্ধ্যগণকে আমি সর্বদা বন্দনা করি।

বুদ্ধ্যের শরণ ব্যতীত আমার আর অন্য কোনো শরণ নেই। এ সত্য বাক্য দ্বারা আমার জয় হোক এবং মজ্জল হোক।

উত্তম অজ্ঞ দ্বারা বুদ্ধ্যের পবিত্র পাদতলে বন্দনা করছি। আমি যদি না বুঝে বুদ্ধ্যের প্রতি কোনো রকম দোষ  
 করে থাকি, হে বুদ্ধ্য আমায় ক্ষমা করুন।

**শব্দার্থ**

ইতিপি সো - এই সেই, ভগবো - ভগবান, অরহং - যিনি মনের সমস্ত রিপুসমূহ বিস্মৃতি করেছেন, বিজ্ঞাচরণ - বিন্যাস ও আচরণ, সুগতো - সুগত (সুপথ অনুসারী), লোকবিন্দু - লোকজ, পুরিসো দম্ম সারথি - পুরুষ দমনকারী সারথি, সত্তা - শিক্ষক বা শাস্ত্রী, দেবমনুসংগং - দেব-মনুষ্যানের ।

**ধর্মের জয় গুণ বন্দনা (পালি)**

সাক্ষাতো ভগবতো ধম্মো, সন্দিট্টিকো, অকালিকো, এহিপসসিকো, ওপনথিকো, পূচত্তং বেদিতবো  
বিএক্কুহীতি ।

ধম্মং জীবিতং পরিযত্তং সরণং গচ্ছামি ।  
যে চ ধম্মা অতীতা চ যে চ ধম্মা অনাগতা,  
পুণ্পদ্মা চ যে ধম্মা অহং বন্দামি সব্বদা ।  
নখি মে সরণং অএক্কং ধম্মো মে সরণং বরং,  
এতেন সূচবজ্জেন হোতু মে জয়মজ্জলাং ।  
উত্তমজ্জেন বন্দেহং ধম্মজ্জ তিবিহং বরং,  
ধম্মে যো থলিতো দোসো ধম্মো ধম্মতু তং মমং ।

**বাংলা অনুবাদ :**

ভগবানের ধর্ম উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত, নিজে দেখার যোগ্য, কালাকালবিহীন, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক জ্ঞাতব্য ।

আমি সত্যজীবন ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি ।  
অতীত, অনাগত এবং বর্তমান ধর্মসমূহকে আমি সর্বদা বন্দনা করি ।

ধর্মের শরণ ব্যতীত আমার আর অন্যকোনো শরণ নেই । এ সত্য বাক্য দ্বারা আমার জয় হোক এবং মজ্জল হোক ।  
আমি উত্তম অজ্ঞ দ্বারা ত্রিবিধ শ্রেষ্ঠ ধর্মকে (মার্গ, ফল এবং নির্বাণ) অবনত মস্তকে বন্দনা করছি । আমি যদি না বুঝে কোনো দোষ করে থাকি, হে ধর্ম আমার ক্ষমা করুন ।

**শব্দার্থ**

সাক্ষাতো - উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত, সন্দিট্টিকো - স্মরণ দ্রুত বা নিজে নিজে দেখার যোগ্য, অকালিকো - কালাকালবিহীন, এহিপসসিকো - এসে দেখার যোগ্য, ওপনথিকো - নির্বাণ প্রাপক, পূচত্তং - প্রত্যক্ষ, বেদিতবো - জ্ঞাতব্য, বিএক্কুহী - বিজ্ঞগণ কর্তৃক ।

**সজ্ঞের নয় গুণ বন্দনা (পালি)**

সুপটিপ্পনো ভগবতো সাবকসস্সো, উত্তপটিপ্পনো ভগবতো সাবকসস্সো, এরাথটিপ্পনো ভগবতো সাবকসস্সো, সমীটিপ্পনো ভগবতো সাবকসস্সো, যদিদং চত্তারি পুরিসম্মানি অট্টপুসিপ্পল্লা এস ভগবতো সাবকসস্সো,

আহুনেয্যো, পাহুনেয্যো অঙ্গলিকরণীযো, অনুত্তরং পুঞ্জঙ্কুর্বেত্তং লোকসসাতি ।

সজ্জং জীবিতং পরিযত্তং সরণং গচ্ছামি ।

যে চ সজ্জা অতীতা চ যে চ সজ্জা অনাগতা,

পুচুপ্পা চ যে সজ্জা অহং বন্দামি সন্ধানা ।

নখি মে সরণং অঞ্জঙ্কং সজ্জো মে সরণং বরং,

এতেন সূচবজ্জেন হোতু মে জয়মজ্জলাং ।

উত্তমজ্জেন বন্দেহং সজ্জঙ্ক দুবিধুত্তমং,

সজ্জে যো বলিতো সোসো সজ্জো যবন্তু তং মমং ।

### বাংলা অনুবাদ :

ভগবানের শ্রাবকসত্ত্ব সূত্রতিপন্ন, সহজ-সরল পথ প্রতিপন্ন, ন্যায় পথ প্রতিপন্ন, সমীচীন পথ প্রতিপন্ন (উত্তম পথ কিংবা উপযুক্ত পথ) । ভগবানের শ্রাবক চার যুগল (প্রোতাপত্তি, স্কৃদাগামি, অনাগামি এবং অর্হং) এবং পুদগল হিসেবে দুপ্রকার পুঞ্জল (মার্গ ও ফল ভেদে) এ আট প্রকার পুঞ্জল । ভগবানের শ্রাবকসত্ত্ব আহ্বান যোগ্য, সংস্কার যোগ্য, উত্তম খাদ্য ভোজ্য দ্বারা পুঞ্জল যোগ্য, অঙ্গলীবন্ধ্য হয়ে করজোড়ে বন্দনার যোগ্য এবং জগতের দেব-নারের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র ।

আমি সারা জীবন সজ্জের শরণ গ্রহণ করছি ।

অতীত, অনাগত এবং বর্তমান সংঘকে আমি সর্বদা বন্দনা করি ।

সজ্জের শরণ বাতিত আমার অর অন্যকোনো শরণ নেই । এ সত্য বাক্য দ্বারা আমার জয় হোক এবং মজ্জল হোক ।

আমি উত্তম অঙ্গ দ্বারা দ্বিবিধ (সম্মতি ও পরমার্থ) শ্রেষ্ঠ সংঘকে বন্দনা করছি । যদি না বুকে কোনো রকম দোষ করে থাকি, হে সংঘ আমার ক্ষমা করুন ।

### সংস্কার

সুপটিপ্পন্নো - সুপথের অনুগামী, সাধকসঙ্কেতা - শ্রাবকসংঘ, উজ্জুপটিপ্পন্নো - সহজ-সরল বা ঋজু পথ প্রতিপন্ন, জায়পটিপ্পন্নো - ন্যায় বা নির্বাণ পথ প্রতিপন্ন, সমীচিপটিপ্পন্নো - সমীচীন, উত্তম পথ বা উপযুক্ত পথে প্রতিপন্ন, চত্তারি - চার, অট্টপূরিসা - আট প্রকার পুরুষ, আহুনেয্যো - আহবান যোগ্য, পাহুনেয্যো - সংস্কার যোগ্য, দক্ষিণেয্যো - দক্ষিণার যোগ্য, অঙ্গলিকরণীযো - অঙ্গলীবন্ধ্য হয়ে করজোড়ে বন্দনার যোগ্য, অনুত্তরং - অনুত্তর, পুঞ্জঙ্কুর্বেত্তং - পুণ্যক্ষেত্র ।

## পাঠ : ৪

## ত্রিরত্ন বন্দনার সুফল

মহাজ্ঞানী বুদ্ধ, তাঁর প্রচারিত ধর্ম এবং প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ অসীম গুণের অধিকারী। ত্রিরত্নের গুণমহিমা পৃথিবীর যে কোনো রত্নের চেয়েও অধিক মূল্যবান। ত্রিরত্ন বন্দনার মাধ্যমে এসব গুণাবলি স্মরণ এবং অর্জনের চেষ্টা করা হয়। তাই ত্রিরত্ন বন্দনার সুফল অনেক। নিচে কতিপয় সুফল তুলে ধরা হলো :

১. স্বভাবতঃ মানুষের চিত্ত বা মন সতত লোভ-দ্বন্দ্ব-মোহপূর্ণী কলিমায় আচ্ছন্ন থাকে। ত্রিরত্নের গুণগাণি স্মরণ করলে মনের কলিমাসমূহ দূরীভূত হয়।

২. চিত্ত বা মন সদা চঞ্চল, দুর্বল, দুর্দমনীয় এবং সর্বত্র বিচরণশীল। লোভ-অলাভ, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি বিচার না করে যত্রতত্র বিচরণপূর্বক দুঃখ প্রদান করে। ত্রিরত্ন বন্দনার ফলে চিত্ত সমাহিত বা একাগ্র হয়। সমাহিত চিত্ত মানুষকে সংলগ্নে পরিচালিত করে। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেছেন, মাতা-পিতা যত না উপকার সাধন করতে পারেন, সমাহিত চিত্ত তার চেয়ে অধিক উপকার সাধন করতে পারে।

৩. চিত্ত সমাহিত হলে কায়-বাক্যও সংযত হয়। ফলে মানুষ নৈতিক জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়।

৪. ধর্ম সাধনায় নৈতিক জীবন অপরিহার্য। কারণ অনৈতিক জীবন অকুশল মনোবৃত্তি সৃষ্টি করে। অকুশল মনোবৃত্তি মানুষের হিতাহিত জ্ঞান নষ্ট করে তৃষ্ণার বশবর্তী করে তোলে। তৃষ্ণায় বশীভূত মানুষ সর্বদা পাপকর্মে লিপ্ত থাকে। ত্রিরত্ন বন্দনা অকুশল মনোবৃত্তি দূর করে চিত্তে কুশল সংস্কার উৎপন্ন করে।

৫. চিত্তে কুশল সংস্কার উৎপন্ন হলে কুশলকর্ম সম্পাদনে উৎসাহী হয়। কুশলকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে পুণ্য অর্জন হয়।

৬. পুণ্য অর্জনের ফলে মৃত্যুর পর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়।

৭. নিয়মিত ত্রিরত্ন বন্দনার ফলে ধর্মতত্ত্ব জানতে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ফলে অশ্রমভ্রমণে ধর্মচরণে সচেষ্ট থাকে।

৮. ত্রিরত্ন বন্দনা অহংবোধ এবং সকল প্রকার জাগতিক ভয়-ভীতি দূর করে মানুষকে পরম শান্তি নির্বাণের পথে পরিচালিত হতে উদ্বুদ্ধ করে।

অনুশীলনমূলক কাজ

চিত্তের স্বভাব কেমন?

সমাহিত চিত্ত সম্পর্কে বুদ্ধ কী বলেছেন?

## অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। ‘ভগবা’ শব্দের অর্থ কী ?

- |            |          |
|------------|----------|
| ক) ভাগ্য   | খ) ভগবান |
| গ) ভবিষ্যৎ | ঘ) ভোগ   |

২। পৌতম বৃন্দকে সুগত বলার কারণ কোনটি ?

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| ক. আহ্বানের যোগ্য বলে      | খ. উপযুক্ত পথে চলিত বলে  |
| গ. নির্বাণে গমন করেছেন বলে | ঘ. লাভ সংকারের যোগ্য বলে |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মিতালী বড়ুয়া বাড়িতে সকালে পুষ্প ও আহ্বার এবং সন্ধ্যায় শ্রদীপ জ্বালিয়ে পূজা করেন। মিতালী বড়ুয়া পূজার সময় স্মরণ করেন—যিনি লোকজ্ঞ, অকালিক এবং স্বাভূতপ্রতিপন্ন তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলে বিবেচিত।

৩। মিতালী বড়ুয়ার সকাল-সন্ধ্যা পূজা করার উদ্দেশ্য কী ?

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| ক. ত্রিরত্নের সেবা করা  | খ. তিস্তুলজ্ঞের সেবা করা          |
| গ. সুখ-শান্তি কামনা করা | ঘ. সকল জীবের মৈত্রীভাব প্রকাশ করা |

৪। মিতালী বড়ুয়ার প্রার্থনা দ্বারা লাভ হবে –

- চিত্ত সংযম
- অমিত্রবোধ দূর
- দুঃখ ও ভয় দূর

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |            |                |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii  | খ. ii ও iii    |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১। রূপালী বড়ুয়া বিহারে গিয়ে ত্রিরত্ন বন্দনাপূর্বক ভিক্ষুর নিকট গৃহীণীল গ্রহণ করেন। প্রথমত, শ্রব্ধেয় ভিক্ষু তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘ভগবানের ধর্ম উপমুগ্ধে ব্যাখ্যাত; নিজে দেখার যোগ্য। কালবিহীন, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রশংসক এবং বিভগণ কর্তৃক জ্ঞাতব্য। দ্বিতীয়ত, ভিক্ষুসঙ্গকে অবহেলা করা উচিত নয়। পারতপক্ষে সঙ্কল্প সেবায় ব্রতী হবেন।

ক. 'ত্রিবিদ্য' কী ?

খ. 'ত্রিবিদ্য' বন্দনার পুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

গ. সুদীর্ঘী বড়ুয়াকে ভিক্ষু শ্রদ্ধামত কোন পুণ্যের বিষয় স্মরণ করিয়ে দেন তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ভিক্ষুসম্মতকে অগ্রহণ করা উচিত নয়' - এ বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত ? - বন্দনার আলোকে যুক্তি প্রদর্শন কর।

২. বিনয় চাকমা খুব জোরে উঠে রাস্তায় অনেক দূর হাঁটাচলা করে থাকেন। তিনি প্রতিদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে ত্রিবিদ্যের গুণ শ্রবণ করেন। একদিন তাঁর এলাকায় অটজন ভিক্ষু পিতৃপাত্র নিয়ে প্রতিবেশীর বাড়ির সামনে উপস্থিত হন। বিনয় চাকমা ভিক্ষুদের নিকট এসে বন্দনা করেন এবং তাঁর পত্নীর রান্নাকৃত খাদ্যদ্রব্য দান করেন।

ক. 'সর্বজ্ঞ' বলতে কাকে বোঝান হয়েছে ?

খ. বন্দনা করার পূর্বস্ফুর্তি সম্পর্কে একটি নিয়ম ব্যাখ্যা কর।

গ. উদীপকে বিনয় চাকমার ঘটনায় ত্রিবিদ্য বন্দনার কোন গুণটি প্রতিফলিত হয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত বন্দনার দ্বারা বিনয় চাকমা প্রাতিহিক জীবনে কী ফল ভোগ করবেন? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও।

**শূন্যস্থান পূরণ কর :**

১. বন্দনায় ত্রিবিদ্যে ----- পরিচয় পাওয়া যায়।

২. অরিকে হত বা বিনাশ করেছেন বলে তিনি -----।

৩. এই ধর্ম বিজ্ঞগণ কর্তৃক ----- ও -----।

৪. আর্থ অষ্টাঙ্গিক মার্গ ----- লাভের সোজা বা ঋজুপথ।

৫. ----- সম্পাদনের মাধ্যমে পুণ্য অর্জন হয়।

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. অষ্টবিদ্যা কী কী?

২. বুদ্ধ্যকে কেন লোকজ্ঞ বলা হয়?

৩. বুদ্ধ্যের ধাবকসম্মতকে কেন নয়্য প্রতিপন্ন বলা হয়?

**রচনামূলক প্রশ্ন :**

১. বুদ্ধ্যের নয়্যগুণ কী কী? বর্ণনা কর।

২. ধর্মের ছয়গুণ ব্যাখ্যা কর।

৩. সজ্ঞের নয়্যগুণ বর্ণনা কর।

৪. ত্রিবিদ্য বন্দনার সুফল নিজের ভাষায় লেখ।

## তৃতীয় অধ্যায়

### শীল

শীল কুশল ধর্মের আধার বা প্রতিষ্ঠাভূমি। কারণ শীলের মধ্যে সমস্ত কুশল ধর্ম প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় লাভ করে বৃষ্টি পোতে থাকে। শীল কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক কর্মকে পরিশীলিত করে। শীল পালনে মনের পরিস্কার নির্ধািত হয়ে শীতল হয়। তাহি এসব আচরণীয় নিয়ম বা বিধি-বিধানকে শীল বলে। শীলের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ নিয়ন্ত্রিত হয় বলে শীলের অপর নাম 'নয়পুণ্য'। নৈতিক ও সুন্দর চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে শীল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কারণে শীল শব্দের অর্থ করা হয়েছে চরিত্র। বৌদ্ধধর্মে গৃহী, শ্রমণ এবং ভিক্ষুদের প্রতিপালনীয় তিনু তিনু শীল রয়েছে। যেমন : পঞ্চশীল, অষ্টশীল, দশশীল এবং প্রাতিমোক্ষশীল। এ অধ্যায়ে আমরা দশশীল সম্পর্কে পড়ব। দশশীল প্রব্রজ্যার্থী শ্রমণদের পালনীয়। তাহি দশশীলকে শ্রামণ্যশীলও বলা হয়। দশশীলে শ্রমণদের পালনীয় দশটি নিয়ম বা বিধি-বিধান রয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

- \* দশশীল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- \* বাংলা অর্থসহ পালি ভাষায় দশশীল বলতে পারব।
- \* দশশীলের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- \* দশশীলের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- \* দশশীলতার ফল বর্ণনা করতে পারব।

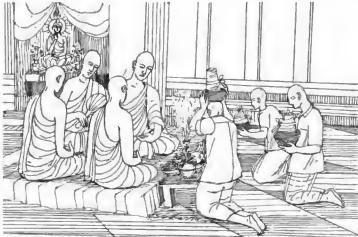
### পাঠ : ১

#### শ্রমণদের পালনীয় শীল

সিদ্ধার্থ গৌতম দুঃখমুক্তির পথ অন্বেষণের জন্য রাজপ্রাসাদের রাজকীয় ভোগ-বিলাস, পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র এবং রাজসিংহাসনের মত্যা ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন অবলম্বন করেন। সুদীর্ঘ ছয় বছর কঠোর সাধনায় তিনি আবিষ্কার করেন দুঃখমুক্তির পথ - আর্থ অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এ মার্গ অনুসরণকারী নির্বাস লাভ করেন। তাহি এ মার্গ দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আদর্শ মার্গ বা উত্তম পথ। সঠিকভাবে এ মার্গ অনুসরণ করার জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে হয়। প্রব্রজ্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে : যিনি পাপমল পরিহার করেন, তিনি প্রব্রজিত নামে কথিত হন। সকল প্রকার পাপ পরিহার করার জন্য সংসার ত্যাগ করে আন্যাত্মিক জীবন গ্রহণ করাকে প্রব্রজ্যা বলে। সংসার একটি আবর্ত বিশেষ। এ আবর্তে পতিত হলে মানুষের পক্ষে নিষ্কৃতি লাভ করা অতীব দুষ্কর। গৃহজীবনে সর্বনা নানা রকম কামেলা এবং বৈষয়িক চিন্তার বিভোর থাকতে হয়। প্রব্রজ্যা জীবন কামেলা ও কামনা বাসনা মুক্ত। তাহি প্রব্রজ্যা সম্পর্কে বৃন্দ্র বলেছেন, সযাযো ঘরবাড়ি অকৃত্যাকোসো পবজজা অর্থ্যা গৃহবাস



ব্যয়মোক্ষ, প্রব্রজ্য অকাশের নয়র উন্মুক্ত। প্রব্রজ্য জীবন দুটি প্রধান ধাপে বিভক্ত। যেমন : শ্রমণ ও ভিক্ষু। প্রব্রজ্য জীবনের প্রথম ধাপ বা শিক্ষানবিশ জীবন পালনকারীকে শ্রমণ বলা হয়। দশশীল শ্রমণদের জন্য নির্ভর পালনীয়। দশশীল বিশুদ্ধ ও অনাসক্ত জীবন এবং পাপমুক্ত সুন্দর চরিত্র গঠনে সহায়ক বলে দশশীলকে সূচরিত শীলও বলে। শ্রমণ জীবনের উচ্চতর স্তর হচ্ছে ভিক্ষু জীবন। ভিক্ষু জীবন প্রব্রজ্য জীবনের দ্বিতীয় ধাপ। ভিক্ষুদের ২২৭টি শীল বা প্রতিমোক্ষ শীল পালন করতে হয়। সাধারণত, প্রব্রজ্য গ্রহণ করে শ্রমণ হওয়ার জন্য কমপক্ষে সাত বছর বয়স হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে, বলা হয়ে থাকে যে, কাক তাড়াতে সক্ষম যে কেউ প্রব্রজ্য গ্রহণ করে শ্রমণ হতে পারে। বাংলাদেশের বৌদ্ধরা সপ্তাহকালের জন্য হলেও প্রব্রজ্য গ্রহণ করে শ্রমণ জীবন পালন করে থাকে। অপরদিকে ভিক্ষু হতে হলে বিশ বছর বয়স হতে হয়। তবে ভিক্ষু হওয়ার আগে কিছুদিনের জন্য হলেও শ্রমণ জীবন পালন করতে হয়।



প্রব্রজ্য ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করছেন

#### অনুশীলনমূলক কাজ

প্রব্রজ্য জীবন কয়টি ধাপে বিভক্ত ও কী কী?

প্রব্রজ্য সম্পর্কে বুদ্ধ কী বলেছেন?

দশশীলকে কেন সূচরিত শীল বলা হয়?

## পাঠ : ২

## দশশীল প্রার্থনা (পালি ও বাংলা)

ওকাস অহং ভত্তে তিসরপেন সন্দিং পকবজ্জা দসসীলং ধম্মং যাচামি,

অনুরাহং কট্টা সীলং দেখ মে ভত্তে ।

দুত্তিমস্সি অহং ভত্তে তিসরপেন সন্দিং পকবজ্জা দসসীলং ধম্মং যাচামি,

অনুরাহং কট্টা সীলং দেখ মে ভত্তে ।

তত্তিমস্সি অহং ভত্তে তিসরপেন সন্দিং পকবজ্জা দসসীলং ধম্মং যাচামি,

অনুরাহং কট্টা সীলং দেখ মে ভত্তে ।

## পেয়ার কৌশল

একজন প্রার্থনা করলে 'অহং' এবং সমবেতভাবে করলে 'মহং'

একজনে করলে 'যাচামি' সমবেতভাবে করলে 'যাচাম'

একজনে করলে 'মে' সমবেতভাবে করলে 'মো' বলতে হবে ।

## বাংলা অনুবাদ :

ভত্তে অবকাশ প্রদান করুন । আমি ত্রিশরপসহ প্রব্রজ্জা দশশীল প্রার্থনা করছি । ভত্তে, দয়া করে আমাকে দশশীল প্রদান করুন ।

দ্বিতীয়বার ভত্তে অবকাশ প্রদান করুন । আমি ত্রিশরপসহ প্রব্রজ্জা দশশীল প্রার্থনা করছি । ভত্তে, দয়া করে আমাকে দশশীল প্রদান করুন ।

তৃতীয়বার অবকাশ প্রদান করুন । আমি ত্রিশরপসহ প্রব্রজ্জা দশশীল প্রার্থনা করছি । ভত্তে, দয়া করে আমাকে দশশীল প্রদান করুন ।

## দশশীল (পালি)

১. পাপাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি ।
২. অনিদানাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি ।
৩. অপ্রচ্ছরিতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি ।
৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি ।
৫. সুরা-মেরেয-মজ্জ পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি ।

৬. বিকালভোজনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।
৭. নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসুদ্ধসংসার বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।
৮. মালা-গম্ভ-বিলেপন-ধারণ-ম-ন বিসুদ্ধসংসার বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।
৯. উচ্চসযনা মহাসযনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।
১০. জাতবুপ-রজত পটিগ্গহনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

### দশশীল (বাংলা)

১. প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকব - এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
২. অলসত্ব হ্রহণ (চুরি) করা থেকে বিরত থাকব - এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৩. অব্রহ্মচর্য থেকে বিরত থাকব - এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৪. মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকব - এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৫. সুরা এবং মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকব - এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৬. বিকাল বেলা ভোজন থেকে বিরত থাকব - এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৭. নাচ-গান-বাদ্যযন্ত্রের উৎসব দর্শন করা থেকে বিরত থাকব - এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৮. মালাধারণ, সুগন্ধিদ্রব্যের প্রলেপ, অলঙ্কার গ্রহণ থেকে বিরত থাকব - এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৯. উচ্চসযা ও মহাশযা (অত্যন্ত আনামদম্মক শযা) শয়ন থেকে বিরত থাকব - এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
১০. সোনা-রুপা বা মুদ্রা আদান-প্রদান ও গ্রহণ থেকে বিরত থাকব - এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

### শব্দার্থ

পবজা - প্রব্রজ্যা, ধম্ম - ধর্ম, তিসরসেন - ত্রিশরথসহ, কড়া - করে, অনুগ্রহং কড়া - অনুগ্রহ করে, বেরমণী - বিরত থাকা, সীলং - শীল, সিক্খাপদং - শিক্ষাপদ, মুসাবাদা - মিথ্যাভাষণ, অদিম্মাদানা - অলসত্ব (চুরি করা বা যা দেয়া হয়নি), নচ্চ - নাচ, গীতবাদিত - গান বাজনা, বিলেপন - প্রলেপ, উচ্চসযনা - উচ্চশয়ন, জাতবুপ রজতং - সোনারূপা, পটিগ্গহনা - প্রতিগ্রহণ।

### পাঠ : ৩

### দশশীল পালনকারীর করণীয়

দশশীল পালনকারীকে জীবন প্রত্যবেক্ষণ, পি-পাত প্রত্যবেক্ষণ, শয্যাসন প্রত্যবেক্ষণ ও দিলান (ঐযথ) প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণ - এই চার প্রকার প্রত্যবেক্ষণ বা পর্যবেক্ষণ ভাবনা করতে হয়। এ প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা দশশীল পালনকারী শ্রমণের অবশ্য করণীয়।

**চীবর প্রত্যবেক্ষণ :**

চীবর পরিধানকারী শ্রমণকে চীবর পরিধানের কারণ চিত্তা বা ভাবনা করতে হবে। চীবর পরিধানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি এবূণ চিত্তা করেন : আমি অর্ধ সংযুক্ত জ্ঞানে এ চীবর পরিধান করছি। চীবর ব্যবহারে চিত্ত সংযত ও সমাহিত হয়। চীবর পরিধানে শীত, তাপ, ধূলাবালি, মশা-মাছির কামড়, সরীসৃপ ও অন্যান্য প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। চীবর পরিধানে লক্ষ্য নিবারণ হয়। উপরোক্ত কারণেই চীবর পরিধান করছি। বিলাসিতা ও পৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য নয়।

**পি-পাত প্রত্যবেক্ষণ :**

ভিক্ষু-শ্রমণগণের ভিক্ষা পাত্রে খাদ্য-ভোজ্য-পোষ্য-পেয় যা কিছু পিত্তাকারে সংগৃহীত হয় তাই পি-পাত। শ্রমণগণ পি-পাত সম্পর্কে এবূণ চিত্তা বা ভাবনা করেন : ভিক্ষা লব্ধ আহার আমি অর্ধ সংযুক্ত জ্ঞানে অবহিত হয়ে ভৈষজ্যবৎ (ঔষধের ন্যায়) অর্ধাৎ জীবন ধারণের প্রয়োজনে গ্রহণ করছি। তা খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ বা কোনোরূপ শক্তি প্রদর্শনের জন্য নয়। আমার এই আহার গ্রহণ ক্ষুধা ও রোগ নিবারণের জন্য। এ পরিমিত আহার বৃন্দ প্রদর্শিত আর্থ অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা মধ্যম পথ অনুশীলনের জন্য গ্রহণ করছি।

**শয্যাসন প্রত্যবেক্ষণ :**

শ্রমণগণ শয্যাসন সম্পর্কে এবূণ চিত্তা বা ভাবনা করেন : আমি অর্ধ সংযুক্ত জ্ঞানে অবহিত হয়ে শয্যা এবং আসন গ্রহণ করছি। শীত ও উষ্ণতা নিবারণ, মশা-মাছির দংশন, বায়ু, দ্রৌদ্র, সরীসৃপ ও ঋতুজনিত নানা উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই শয্যাসন গ্রহণ করছি। কর্মস্থান ভাবনা ও একাগ্রতা সাধনার জন্য এ শয্যাসন গ্রহণ করছি। শুল্ক আলস্য বা নিদ্রা ঘাপন করে বৃথা সময় ক্ষেপণের জন্য নয়।

**পিলান প্রত্যবেক্ষণ :**

শ্রমণগণ পিলান প্রত্যবেক্ষণ সম্পর্কে এবূণ চিত্তা বা ভাবনা করেন : আমি অর্ধ সংযুক্ত জ্ঞানে অবহিত হয়ে রোগ উপশমের জন্য পিলান বা ঔষধ সেবন করি। নানা রকম দুঃখ দায়ক বেসনাসহু থেকে নিরাময় হওয়ার জন্য ঔষধ সেবন করি। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ঔষধ সেবন করি না।

**অনুশীলনমূলক কাজ**

দশশীল পালনকারীকে কী কী ভাবনা করতে হয়?

পাঠ : ৪

**দশশীলের গুরুত্ব**

চরিত্রিক শৃঙ্খতাই ধর্ম চর্চার মূল ভিত্তি। শীলের লক্ষ্য হচ্ছে পাপের পঙ্কিল পথ পরিহার করে এবং পাপমূলে কুঠারঘাত করে মানুষের চরিত্রকে সংযত, শৃঙ্খল ও সুন্দর করা। তাই শীলকে মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মিলিন প্রস্তু গ্রন্থে শীল সম্পর্কে এবূণ উল্লেখ আছে : পাহাড়, পর্বত, বৃক্ষলতা

প্রকৃতি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বৃষ্টি ও বিপুলতা লাভ করে তেমনি সারকগণ শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভাবনা করে থাকেন। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, 'শীলের দ্বারা সমাধি প্রবর্ণিত হয়। সমাধির দ্বারা প্রজ্ঞা প্রবর্ণিত হয়। প্রজ্ঞা প্রবর্ণিত চিত্ত কামাসব, ভবাসব ও অবিদ্যাসব থেকে মুক্তি লাভ করে।' আসবমুক্ত চিত্ত চির প্রশান্তি লাভ করে। এ কারণে তথাগত বুদ্ধ মানব কল্যাণে শীলের গুরুত্ব উপলব্ধি করে শীল পালনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং শীল লঙ্ঘনকে মহাপাপ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, 'দুঃশীল ব্যক্তির শতবর্ষের জীবন অপেক্ষা শীলবান ব্যক্তির একদিনের জীবন শ্রেয়।' শীল পালনের সুফল অনেক। যেমন : শীলবান ব্যক্তির মহাভোগ সম্পত্তি লাভ হয়। তিনি সর্বত্র প্রশংসিত হন, সর্বত্র নিঃসঙ্কেতে উপস্থিত হন, সজনে সেহ ভোগ করেন এবং মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ করেন। এসব কারণ বিবেচনা করে বলা যায়, শীল পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে দশশীলের গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো :

১. হিংসা, ক্রোধ ও ভেদবিশৃঙ্খল কারণে আঘাত এবং হত্যা করা হয়। দশশীলের প্রথম শীলটি এসব অমানবিক প্রবৃত্তি দূর করে এবং সর্বাঙ্গের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন করে তোলে।
২. সোভ, মোহ ও তৃষ্ণা বশত মানুষ অলভ সত্ত্ব গ্রহণ করে। দ্বিতীয় শীলটি এ অশুভ মনোবৃত্তিসমূহ দূর করে এবং নিজের পরিশ্রম লব্ধ সত্ত্ব ভোগ করতে উদ্বুদ্ধ করে।
৩. অসংযত ইন্দ্রিয় বা কাম লালসার কারণে মানুষ অপ্রত্যাচার আচরণ করে। তৃতীয় শীলটি ইন্দ্রিয় দমন করে অনৈতিক কামাচার পরিত্যাগ করতে এবং বুদ্ধ নির্দেশিত প্রত্যাচারী পালনে উৎসাহী করে।
৪. মিথ্যা, কটু, অসারকথা প্রভৃতি বগড়া বিবাদ সৃষ্টি করে এবং মানুষকে দুঃখ দেয়। পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য নষ্ট করে। চতুর্থ শীল এসব থেকে বিরত রাখে সত্য, সংযত, সারথুক্ত কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করে।
৫. মাদক দ্রব্য মানুষের স্মৃতি এবং হিতবিত্ত জ্ঞান নষ্ট করে। মানুষকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে। শ্রামণ্য জীবনের পরিপন্থি অনৈতিক কাজে প্রলুপ্ত করে। পঞ্চমশীল এসব কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করে সুস্থ ও স্মৃতিময় জীবন যাপনে সহায়তা করে।
৬. অপরিমিত ভোজন ইন্দ্রিয়কে অসংযত ও উত্তেজিত রাখে। ইন্দ্রিয় লিপ্তা মানুষকে অনৈতিক কামাচার ও অতিরিক্ত ভোগ স্পৃহায় প্রলুপ্ত করে। ষষ্ঠ শীল ইন্দ্রিয় দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংযত জীবন যাপন এবং যান-সমাধিতে অধিক মনোনিবেশ করতে প্রেরণা যোগায়। তাছাড়া অল্প মানুষের ক্ষুধার জ্বালা-যন্ত্রণা বুঝতে ও তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে শিক্ষা দেয়।
৭. নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রভৃতি বিশোদনমূলক কর্মকাণ্ড- মানুষের মনকে বিক্ষিপ্ত করে। ভোগ-লালসা ও কামোদ্দীপক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে। দায়িত্ব ও কর্তব্য হতে বিচ্যুত করে। সপ্তম শীল শান্ত-সংযত জীবন গঠনে ভূমিকা রাখে।
৮. মালাধারণ, সুগন্ধ প্রসাধনী লেপন ও নানা রকম গহণা পরিধান ভোগ-বিলাসের প্রতি আসক্ত করে তোলে। ভোগ-বিলাস প্রত্যাচারী আচরণের পথে বাধা অন্তরায়। অষ্টম শীল ভোগ-বিলাসের আসক্তি বিমূর্তিত করে প্রত্যাচারী পালনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।

৯. বিলাসবহুল শয়নাসন মানুষকে আরামপ্রিয়, অলস ও উদাম হীন করে তোলে। নির্বাণ লাভের জন্য উদাম বা সম্যক প্রচেষ্টা অপরিহার্য। নবম শীল অলসতা ও আরামপ্রিয়তা দূর করে উদামশীল করে তোলে।

১০. কথায় বলে অর্থ অনর্থের মূল। স্বর্ণ-রৌপ্য অর্থ সম্পদ মানুষের তৃষ্ণা বর্ধিত করে। তৃষ্ণা দুঃখের মূল কারণ। দশম শীল তৃষ্ণা কম করে এবং দুঃখ মুক্ত করে পরম শান্তি নির্বিশেষ পথে উপনীত করে।

মানবতা ও নৈতিকতার সব বৈশিষ্ট্য দশশীলের মধ্য নিহিত আছে। ফলে দশশীলের পুণ্ড্র যে অপরিণীম তা সহজে বোধগম্য।

### পাঠ : ৫

#### দুঃশীলতার ফল

যারা শীল পালন করেন তাঁদের শীলবান বলা হয়। অপরদিকে যারা শীল পালন করে না তাঁদের দুঃশীল বলা হয়। দুঃশীল ব্যক্তি দুষ্টরিক্তের অধিকারী হয়। তারা সর্বদা পাপকর্মে লিপ্ত থাকে। বিবেক বোধ হারিয়ে ফেলে। ফলে ভালো-মন্দ বিচার করতে পারে না। পরিবার ও সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে শান্তি বিনষ্ট করে। তারা নিজের এবং অপরের ক্ষতি সাধন করে। নিচে দুঃশীলতার কতিপয় ফল তুলে ধরা হলো :

১. দুঃশীল ব্যক্তি প্রমাদের বশবর্তী হয়ে ষড়্য় সম্পত্তি বিনষ্ট করে।
২. অকুশল কাজের জন্য তারা সর্বত্র নিন্দিত হয়।
৩. সভা সমাবেশে সংজ্ঞাচ্য বোধ করে এবং মৌন থাকে।
৪. মোহাবলম্বী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।
৫. মৃত্যুর পর দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

এসব কারণ বিবেচনা করে দুঃশীলতা পরিহার করে সকলের শীল পালন করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

আরো পাঁচটি দুঃশীলতার ফল বল

## অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। শ্রমণদের নিত্য পালনীয় শীল কোনটি ?

- |            |                   |
|------------|-------------------|
| ক) পঞ্চশীল | খ) অষ্টশীল        |
| গ) দশশীল   | ঘ) প্রাতিমোক্ষশীল |

২। বুদ্ধ প্রদর্শিত দশশীল পালন করা উচিত কারণ এতে -

- পরজন্মে মুক্তির পথ সুগম হয়
- বুদ্ধশাসন সজীব হয়
- বিশুদ্ধ ও অন্যসত্ত্ব জীবন যাপন করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |            |                |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii  | খ. ii ও iii    |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদ দুটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

দায়ক : ওকাস অহং ভণ্ডে তিসরনেন সম্বিৎ পকজ্জা

দসসীলং ধম্মং যাতামি অনুস্সহং কত্তা সীলং সেথ পে ভণ্ডে ।

ভণ্ডে : ক্রমানুসারে বলেন -

১। পাশাতিপাত্তা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি

২। .....

৩। ( ? )

৪। .....

৫। .....

৬। বিকাল ভোজনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি

৭। .....

৮। .....

৯। .....

১০। জাত-রূপ-রজত পটিগ্গহনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি ।

৩। ভগ্নের উচ্চারিত '২' চিহ্নিত শীলের সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি ?

- |                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| ক. কামেসু মিচ্ছাচরা | খ. অবুচ্ছাচরিখা                 |
| গ. মুগাবাদা         | ঘ. সুরা মেয়ে মজাজ পমাদ্‌ট্টানা |

৪। উক্ত শীল কাদের জন্য প্রযোজ্য ?

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| ক. সাধারণ গৃহীদের  | খ. দায়ক-দায়িকাদের |
| গ. ভিক্ষু-শ্রমণদের | ঘ. উপাসক-উপাসিকাদের |

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শূদ্রশীল বড়ুয়া ও সাগর বড়ুয়া দুই ভাই। তাদের পিতামাতা একদিন এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে তাদেরকে প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা দেন। শূদ্রশীল বড়ুয়া শ্রামণ্যনীতি অনুসরণ করে দশশীলের গুণাবলি নিজ জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেন। অপরদিকে সাগর বড়ুয়া শ্রমণদের নিত্য পালনীয় শীল পালন না করে বিভিন্ন ধরনের গান বাজনা শোনা, সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার ও টাকা-পয়সা গ্রহণ করতে থাকে।

- ক. বুদ্ধ নির্দেশিত কয় প্রকার আর্হসত্য রয়েছে ?
- খ. দশশীলের সত্তম শীলটি ব্যাখ্যা কর।
- গ. সাগর বড়ুয়ার আচরণ কোন শীলের নীতি বিরোধী ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উক্ত শীল পালন করে শূদ্রশীল বড়ুয়া ইহ ও পরকালে কী সুফল ভোগ করবে ? বিশ্লেষণ কর।

২। বিনয়ানন্দ শ্রমণ মনিকছড়ি ভাবনা কেন্দ্রে গিয়ে ধ্যান চর্চা করতে থাকেন। সেখানে তিনি শ্রামণ্যশীল পালন করে চার প্রত্যবেক্ষণ, পি-পাত প্রত্যবেক্ষণ, শব্দনাসন প্রত্যবেক্ষণ ও দিলান প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণ - এই চার প্রকার প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা করতে থাকেন। এতে তাঁর চিন্তা সমাহিত হয়।

- ক. শ্রমণ শব্দের অর্থ কী ?
- খ. দশশীল ব্যক্তি কীরূপ ফল লাভ করে? বর্ণনা কর।
- গ. বিনয়ানন্দ শ্রমণ কোন ভাবনা করেছেন পাঠ্যপুস্তক কের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. 'বিনয়ানন্দ শ্রমণ পালনীয় শীলের গুরুত্ব অত্যধিক' - এ বক্তব্যের সাথে তুমি কী একমত, যুক্তি দেখাও।

### শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. শীল কুশল ধর্মের . . . বা . . . ।
২. শীল পালনে মনের . . . নির্বাপিত হয়ে শীতল হয়।
৩. প্রব্রজ্যা জীবন . . . ও . . . বাসনা মুক্ত।
৪. . . ভাবনা দশশীল পালনকারী শ্রমণের অবশ্য করণীয়।
৫. শীলকে মানব জীবনের . . . . . হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।



৬. দুঃশীল ব্যক্তি . . . বশবর্তী হয়ে স্বীয় সম্পত্তি বিনষ্ট করে।  
 ৭. মালিক দ্রব্য মানুষের . . . এবং . . . জ্ঞান নষ্ট করে।

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. শীলের অপর নাম কী এবং কেন?
২. পি-পাত প্রত্যবেক্ষণ ভাবনার সময় কীরূপ চিন্তা বা ভাবনা করতে হয়?
৩. শীলের লক্ষ্য কী?
৪. দুঃশীল ব্যক্তির চরিত্র কেমন?

**রচনামূলক প্রশ্ন :**

১. দশশীল কী কী লেখ।
২. দশশীলের বাংলা অনুবাদ লেখ।
৩. দশশীলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
৪. দুঃশীলতার কুফল বর্ণনা কর।

## চতুর্থ অধ্যায়

### দান

‘দান’ একটি মহৎ মানবীয় গুণ। নিঃস্বার্থভাবে যা দেয়া হয়, তা-ই দান। নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে অপরের উপকারের জন্য যিনি দান কার্য সম্পাদন করেন, তিনি একজন মহৎ ব্যক্তি। বৌদ্ধধর্মে দানের গুরুত্ব অপরিসীম। দান পারমীর পূর্ব না করলে নির্বাপ লাভ সম্ভব নয়। তথাগত বুদ্ধ ‘বুদ্ধত্ব’ লাভের জন্য দশ পারমীর মধ্যে দান পারমীকেই প্রথম স্থান দিয়েছেন। দানীরাই দান করতে পারেন তা নয়, চিত্তের উদারতা থাকলে গরিবরাও দান করতে পারে। অনেক বিভবীন ব্যক্তি ও শূন্য চিত্তের উদারতার কারণে দান করে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। দান করার ক্ষেত্রে পাত্র-অপাত্র, দানীয় বস্তু ও মানসিক অবস্থা প্রভৃতি বিবেচনা করতে হয়। দান একটি কুশল কর্ম। অন্যান্য কুশলকর্মের মতো দানেরও সুফল বা প্রভাব আছে। এ অধ্যায়ে আমরা দানের বিবেচ্য বিষয়, তিনটি দান কাহিনী এবং দানের প্রভাব সম্পর্কে পড়ব।

#### এ অধ্যায় শেষে আমরা -

- \* বৌদ্ধ দান কাহিনী বর্ণনা করতে পড়ব।
- \* দানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় উল্লেখ করতে পড়ব।
- \* দানের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পড়ব।

### পাঠ : ১

#### দানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করতে হয়। তাই কোন কাজ করার পূর্বে কর্মফল সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। বৌদ্ধধর্মে নিঃস্বার্থভাবে কোনো কিছু ত্যাগ করলেই দান হয় না, দান দিতে হলে দানীয় বস্তু, দাতা ও দানের ক্ষেত্র বা গ্রহীতার বিষয়ে বিবেচনা করতে হয়। দানের বিবেচ্য বিষয়গুলো নিচে সংক্ষিপ্তভাবে জানব।

বৌদ্ধধর্মে দানীয় বস্তু র ক্ষেত্রে প্রধানত তিনটি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। যথা : ১। বস্তু সম্পত্তি ২। চিত্ত সম্পত্তি এবং ৩। প্রতিপ্রাণিক সম্পত্তি।

#### ১। বস্তু সম্পত্তি :

বৌদ্ধধর্মে সং-উপায়ে অর্জিত বা লব্ধ টাকা-পয়সা বা বস্তু কে বস্তু সম্পত্তি বলা হয়। অর্থাৎ দানীয় বস্তু টি ন্যায়সম্মতভাবে অর্জিত হয়েছে কিনা তা বিবেচনা করা। অসদুপায়ে লব্ধ টাকা-পয়সা বা বস্তু দান করা উচিত নয়। এরূপ দানকে মিশ্রদান বলে। মিশ্রদান হীন দান। দানীয় বস্তু তিন প্রকার। যথা : আমিশ দান, অন্তর দান ও ধর্ম দান। আমিশ দান দুই প্রকার : বাহিরের বস্তু ও ভিতরের বস্তু। বাহিরের বস্তু হচ্ছে অন্ন, বস্ত্র, শাশী, বাসস্থান, পরিষ্কার করার জিনিস, ধূপ, বাতি, যানবাহন, ঔষধ, বাড়ি, প্রাসাদ, কুটির, বিহার ইত্যাদি

নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু । তিতরের বস্তু হচ্ছে – নিজের হাত, পা, চোখ, কিডনি, হৃৎপিণ্ড, রক্ত, চর্ম ইত্যাদি যা গ্রহীতার নিত্যই উপকারে আসবে জেনে দাতা দান করে থাকেন । হিসার বশবর্তী হয়ে কৃতি করার জন্য যদি কেউ দানীয় বস্তু গুলো প্রার্থনা করে তখন তা দান করা উচিত নয় ।

**অজ্ঞান দান:** অজ্ঞান দান হল নিরাশ্রয়, বিপদাপন্ন, অসহায় মানুষ ও প্রাণীকে আশ্রয়, নির্ভরতা, সেবা প্রভৃতি দান করা যাতে সে নিরাপদ হয় ।

**ধর্ম দান :** ধর্ম দান হল মৈত্রী দান, পুণ্য দান, জ্ঞান দান প্রভৃতি । ধর্ম দান অর্থাৎ নৈতিকতার পথে আসতে সাহায্য করা ।

বৌদ্ধধর্মে দান করার ক্ষেত্রে বস্তু সম্পত্তি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা উচিত ।

## ২। চিত্ত সম্পত্তি :

বুদ্ধ চৈতন্যকে কর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন । চিত্তের কুশল চৈতন্য কুশল কর্ম, অকুশল চৈতন্য অকুশল কর্ম হিসেবে অভিহিত । চৈতন্য কুশল কর্ম যত চিন্তা করা যায়, ততই পুণ্য বৃদ্ধি পায় । দান দেয়ার পূর্বে সজ্ঞা চিত্ত থাকা, দান দিয়ে চিত্তকে প্রশস্ত করা এবং দেয়ার পরও চিত্তে অপার অনন্দ উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন । তাই দান দেয়ার পূর্বে, দান দেয়ার সময় এবং দান দেয়ার পর চিত্ত সোভ-স্বৈ-সোহ যুক্ত থাকা এবং কুশল চৈতন্য যুক্ত থাকা উচিত । তাই বুদ্ধের উপদেশ স্মরণ করে অতি শান্ত ও পবিত্র মনে উদার চিত্তে দান করা উত্তম ।

দানের ক্ষেত্রে যিনি কুশল চিত্তে দান করেন শুল্ক তিনিই যে পুণ্য ফল অর্জন করেন তা নয়, অন্যরা যারা ঐ দান অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা ও উদার চিত্তে অংশগ্রহণ করেন এবং সাহায্যে সজ্ঞা দান অনুমোদন করেন তাঁরাও পুণ্যফল অর্জন করেন । দান চর্চার বিষয় । ধন-সম্পদ থাকলেও সবাই দান করতে পারে না । এর কারণ চিত্তের উদারতা ও কুশল চৈতন্যের অভাব । চিত্তের এই অবস্থাকে চিত্তসম্পত্তি বলা হয় । প্রত্যেকের দান অনুশীলন করা উচিত ।

## ৩। প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি :

বৌদ্ধধর্মে মতে, দানের ফল নির্ভর করে দান গ্রহীতার চারিত্রিক শুদ্ধিতার উপর । তাই দান দেয়ার পূর্বে দান গ্রহীতা সম্পর্কেও বিচার বিবেচনা করা উচিত । বিবেচনা না করে দান দিয়ে উদ্ভো ফলও হতে পারে । যেহেতু, যদি একজন নির্ভর ভাবকে অর্থ দান করা হয়, সে তা দিয়ে মদ্যপান মিনে মানুষ হত্যা করতে পারে । এমনকি দাতাকেও হত্যা করতে পারে । তাই দান গ্রহীতার সম্পর্কে বিবেচনা করে দান দেয়া উচিত । দান গ্রহণের উপযুক্ত পাত্রকে প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি বলা হয় ।

দানের ক্ষেত্রে সময় ও গ্রহীতার প্রয়োজনও বিবেচনা করা উচিত । গ্রহীতার প্রয়োজন বিবেচনা করে দান করলে সেই দানকে ‘কালদান’ বলা হয় । গ্রহীতার প্রয়োজন অনুসারে দান করলে একে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই উপকৃত হয় ।

বুদ্ধ, ধর্ম ও সত্য হচ্ছে দানের সর্বশেখা উপযুক্ত পাত্র । বুদ্ধ বর্তমান থাকলে তাকে দান করলে সর্বাধিকৃষ্ট ফল লাভ করা যায় । সম্বন্ধের প্রচার-প্রসারে দান করলে তা উৎকৃষ্ট দান হয় । কারণ সম্বন্ধ মানুষকে নৈতিক ও দুঃখ মুক্তির পথে পরিচালিত করে । শীলবান ভিক্ষুসংঘও দানের উত্তম পাত্র । শীলবান ভিক্ষুগণ সম্বন্ধের ধারক-বাহক । এছাড়া শীলবান অথচ ভিক্ষু নয় এমন ব্যক্তিকেও তাঁর উপকারার্থে দান করা যায় । পশু, পাখি, সরীসৃপ, পোক ইত্যাদিকেও

দান করা যায়। স্বর্ণ ও নরকবাসী মৃত জাতিগণের উদ্দেশ্যে দান করা যায়। এই দানেও শতসহস্র গুণ পুণ্যফল অর্জিত হয়।

#### দাতা ও গ্রহীতা :

কোনো কোনো দান দাতার দ্বারা মহাফলপ্রদ হয় অথচ গ্রহীতার দ্বারা হয় না। আবার কোনো কোনো দান গ্রহীতার দ্বারা মহাফলপ্রদ হয়, কিন্তু দাতার দ্বারা হয় না। কোনো কোনো দান দাতা ও গ্রহীতা কোনো পক্ষের দ্বারা মহাফলপ্রদ হয় না। আবার কোনো কোনো দান দাতা ও গ্রহীতা উভয় পক্ষের দ্বারা মহাফলপ্রদ হয়।

শীলবান দায়ক যদি দুঃশীল গ্রহীতাকে দান করে, তা দায়কের শীলগুণ প্রভাবে মহাফলপ্রদ হয়। শীলবান রাজা বেসসান্তর যেমন জুহুকে ব্রাহ্মণকে দান দিয়ে পৃথিবী কাম্বিত করেছিলেন। দুঃশীল দায়ক যদি শীলবান গ্রহীতাকে দান করে, তা গ্রহীতার দ্বারা মহাফলপ্রদ হলেও দায়কের দ্বারা নহে। দাতা গ্রহীতা উভয়ে দুঃশীল হলে সেই দান কোনো পক্ষ হতেই মহাফলদায়ী হয় না। দাতা – গ্রহীতা উভয়ে যদি শীলবান হয়, তবে উভয়পক্ষের শীলগুণে সেই দান মহাফলপ্রদ হয়ে থাকে।

এজন্যই দান সম্পর্কে শাস্ত্রে বলা হয় –

যো সীলবা সীলবন্তেসু দদতি দানং

যেমন লব্ধং সুপসন্ন চিত্তো,

অভিসম্ভবং কাম্যফলং উল্লাসং

তবে দানং বিপুল ফলতি ব্রুমি

**বাংলা অনুবাদ :** যে শীলবান ধর্ম দ্বারা উপার্জিত বহু উদার কর্মফল শাস্ত্রসম্মত সুপ্রসন্ন চিত্তে শীলবানকে দান দিয়ে থাকে, অমি বলি, সে দান শিগ্গেই বিপুল ফল প্রদান করে থাকে (করণ তা দায়ক ও প্রতিগ্রাহক উভয়ের শীল গুণ দ্বারা বিশুদ্ধ)।

#### অনুশীলনমূলক কাজ

দানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ কর।

দানীয়বস্তু র একটি তালিকা তৈরি কর।

‘কালদান’ কাকে বলে।

## পাঠ : ২

## দান কাহিনী

## কাহিনী : ১

সৌতম বুদ্ধ পূর্বজন্ম স্মরণ করতে পারতেন। শিষ্য এবং উপাসকদের উপদেশ দেওয়ার সময় তিনি প্রায়ই তাঁর পূর্বজন্মের কুশলকর্মের নানা কাহিনী বর্ণনা করতেন। এই কাহিনীগুলো জাতক নামে পরিচিত। জন্ম-জন্মান্তরে বুদ্ধ হওয়ার জন্য তিনি নানা কুলে জন্মগ্রহণ করে পায়সীসমূহ পূর্ণ করেছিলেন। প্রতিটি জন্মে তিনি বোবিসত্ত নামে অভিহিত। বোবিসত্ত অবস্থায় তিনি অনেক দান করেছেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে বোবিসত্তের অনেক দান কাহিনী আছে। এখন এরূপ একটি দান কাহিনী পড়ব।

একবার বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোবিসত্ত দরিদ্রকূলে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তিনি এক শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে দিন মজুর হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতেন। একদিন তিনি চারটি সিংহ ঘব কিনে নিয়ে কাজে যাচ্ছিলেন। ঐ সিংহ ঘবগুলো ছিল তাঁর খাদ্য। কাজে যাওয়ার পথে তিনি চারজন প্রত্যেকবুদ্ধের দেখা পেলেন। তাঁরা ভিক্ষালু সংগ্রহে বের হয়েছিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধগণ শীলবান ছিলেন। তাঁদের দেখে বোবিসত্ত সিংহ ঘবগুলো দান দেবেন বলে সিদ্ধ করলেন। তিনি তখন তাঁদের বন্দনা করে দানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। দাতার আগ্রহ দেখে প্রত্যেকবুদ্ধগণ দান গ্রহণে সম্মত হলেন। বোবিসত্ত পরিষ্কার স্থানে চারটি আসন প্রস্তুত করে তাতে বুদ্ধগণের বসার ব্যবস্থা করলেন এবং অহস্তে সিংহ ঘবগুলো তাঁদের আহ্বারের জন্য দান করলেন। প্রত্যেকবুদ্ধগণ দান অনুমোদন করলেন। দান অনুমোদনের পরে বোবিসত্ত প্রত্যেক বুদ্ধগণের নিকট প্রার্থনা করলেন যে, এই দানের ফলে তিনি যেন পরবর্তী জন্মে দরিদ্র ঘরে জন্মলাভ না করেন। প্রত্যেকবুদ্ধগণ প্রার্থনা অনুমোদন করে আশীর্বাদ করলেন। বোবিসত্ত দানজনিত প্রীতি অনুভব করলেন।

বোবিসত্ত যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন এই দানের কথা স্মরণ করতেন। মৃত্যুর পর তিনি বারাণসীর রাজার পুরোঁপে পুনরায় জন্মলাভ করেন। তখন তাঁর নাম হয় ব্রহ্মদত্ত কুমার। বড় হয়ে তিনি তক্ষশীলার পিয়ে সর্বিদ্যায় পারদর্শীতা অর্জন করলেন। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত হলেন।

বোবিসত্ত রাজা হয়ে কেশল রাজ্যের পরমা সুন্দরী কন্যাকে অগ্রমহিষী করলেন। এই অগ্রমহিষী পূর্বজন্মে শীলবর্তী নারী ছিলেন। দাসীবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করলেও তিনি সচরিত্র সম্পন্ন ছিলেন। একদিন তিনিও বৌদ্ধ ভিক্ষুক নিজের খাদ্য সম্বন্ধে চিন্তে আনন্দের সঙ্গে দান করেছিলেন। সেই দানফলে তিনি পরজন্মে কেশল রাজকন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পরে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের অগ্রমহিষীর পদ লাভ করেন। রাজা ও রানি উভয়েই অত্যন্ত দানশীল ছিলেন এবং ছয়টি দানশালা স্থাপনের মাধ্যমে তাঁরা দান কর্ম করতেন।

## অনুশীলনমূলক কাজ

গল্পে বর্ণিত দান কাহিনীর বিশেষত্ব চিহ্নিত কর।

## কাহিনী : ২

রাজা বেসুসাত্তর অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। একবার একজন দুঃশীল পানী প্রার্থণ তাঁর দানধর্ম পরীক্ষা করার জন্য তাঁর সন্তানদের ভিক্ষা চাইলেন। শীলবান রাজা বেসুসাত্তর উদার ও প্রসন্ন চিত্তে পাশী ব্রাহ্মণকে জেলে-মেয়ে দান করেছিলেন। তাঁর এই দানের মহীমায় পৃথিবী কঁপে উঠেছিল। রাজা বেসুসাত্তর দুঃশীল জুজুক ব্রাহ্মণের অবশুণ বাদনা সম্পর্কে জানতেন না। তিনি রাজাকে প্রবঞ্চনা করতে এসেছিলেন। কিন্তু শীলবান রাজা তাঁর উদার দানধর্ম থেকে বিরত হননি। তিনি নিজের জীবনের চেয়ে প্রিয় সন্তানদের দুঃশীল ব্রাহ্মণের হাতে দান করলেন। ব্রাহ্মণ ঘনন সন্তানদ্বয়কে নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করলেন তখন হঠাৎ রক্তবমি করতে লাগলেন এবং এখানেই প্রাণ ত্যাগ করলেন। রাজা সন্তানদের ফিরে সেলেন। তাঁর দানের মহত্ব বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এ থেকে বোকা যায় যে, উদার ও প্রসন্ন চিত্তে শ্রম্যার সঙ্গে দুঃশীল ব্যক্তিকে দান করলে সেই দান দাতার গুণ দ্বারা বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। বিশুদ্ধতা প্রাপ্তি অর্থ মহাফলদায়ক, যা মহা পুণ্য লাভের কারণ।



রাজা বেসুসাত্তর ব্রাহ্মণকে সন্তান দান করছেন

## কাহিনী : ৩

আরেকবার কল্যাণ নদীর তীরে বসবাস করত এক জেলে। নদীর মাছ শিকার করে সে জীবিকা অর্জন করত। এই জেলে দীঘসোম সন্ধ্যার নামে একজন শীলবান ভিক্ষুকে তিনবার পিণ্ডদান করেছিলেন। শেষ জীবনে এবং ঘর-ও, দৌ ঘর ও নৈতিক শিক্ষা-অটম শ্রেণি

মৃত্যুর সময়ও এই জেলে তাঁর দানময় অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করতেন। তিনি চিন্তা করতেন, “আমি আর্য দীঘসোম স্বধিরকে যে পিতৃদান দিয়েছিলাম তা আমার অনেক পুণ্য অর্জনের এবং পাপ ক্ষয়ের কারণ হয়েছে।” এই দান ও কুশল কর্মের চেতনার ফলে তিনি অনেক পুণ্যফল অর্জন করেছিলেন। এক্ষেত্রে প্রতিগ্রাহকের গুণে দান মহাফল প্রদান করেছে।

### অনুশীলনমূলক কাজ

দান কাহিনী ২ এবং ৩-এর শিক্ষণীয় বিষয় আলোচনা কর

### পাঠ : ৩

### দানের প্রভাব

দানের প্রভাব অপরিমিত। সংহদান, অষ্ট পরিষ্কার দান ও কঠিন চীবর দান ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সমবেতভাবে শীলময়, দানময় ও ভাবনাময় চিন্তে পৃথকীয় ভিক্ষুসংঘকে দান করে থাকি। দান ব্যক্তি, সমাজ এবং ধর্মীয় জীবনের উৎকর্ষতা সাধন করে। নিম্নে ব্যক্তি, সমাজ এবং ধর্মীয় জীবনে দানের প্রভাব আলোচনা করা হলো।

**ব্যক্তি জীবনে দানের প্রভাব :** দান মানুষের মানবিক ও মৈতৈক গুণাবলির বিকাশ সাধন করে। দান দ্বারা লোভ-দ্বেষ-মোহ বেদন বিদূরিত হয়, তেজমি মৈত্রী, কল্যাণ, পরোপকারী মনোভাব, সহমর্মিতা ও দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি হয়। এসব গুণাবলির অধিকারী ব্যক্তি মহৎ কর্ম সম্পাদন করতে পারেন। ফলে আত্মতৃপ্তি ও অনন্দ লাভ করেন। সর্বত্র প্রশংসিত ও পূজিত হন। তাঁর কীর্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ভালো বশু লাভ করেন। কখনো বিপদ ও অশান্তি গ্রস্ট হয় না।

**সমাজ জীবনে প্রভাব :** দানশীল ব্যক্তির দান দ্বারা সমাজে অনেক কল্যাণ সাধিত হতে পারে। বিদ্যালয়, হাসপাতাল, অশ্রম আশ্রম প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাট মেরামত ও উন্নয়ন, কন্যা দায়গ্রস্ট অতিভাবক ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে সহায়তা, কর্মসংস্থানের উপায় সৃষ্টি, জলাধার স্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে দান করলে সমাজের উন্নয়ন ও বহুজনের উপকার সাধিত হয়। রক্ত দান, চোখ দান ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ জীবন যাপনে আশা জাগায়, দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টি ফিরে গেতে সাহায্য করে। ধর্মীয় দানানুষ্ঠান সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করে। ফলে সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়।

**ধর্মীয় জীবন গঠনে দানের প্রভাব :** নির্বাণ লাভ করতে হলে দর্শপারমী পূর্ণ করতে হয়। দর্শপারমীর মধ্যে দান পারমীর স্থান সর্বোচ্চ। লোভ-দ্বেষ-মোহের কারণে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণাই সকল দুঃখের মূল কারণ। তৃষ্ণার কারণে মানুষ বারবার জন্মগ্রহণ করে দুঃখ ভোগ করে। তৃষ্ণাকে কল্প করতে পারলে দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। দানের ফলে লোভ-দ্বেষ-মোহ বিদূরিত হয়। তৃষ্ণার কয় হয়। তৃষ্ণা মুক্ত মানুষ আর জন্মগ্রহণ করেন না। ফলে মানুষ দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করে নির্বাদের পথে অগ্রসর হন। দান পারমী পূর্ণকারী ব্যক্তি প্রোতাপতি, সদ্ধৃদাণী, অনাগামী এবং অর্হন্ত ফল লাভ করেন। এভাবে দান ধর্মীয় জীবন গঠনে পূর্বত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

### অনুশীলনী

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। দান কি ?

- |              |           |
|--------------|-----------|
| ক) কুশল কর্ম | খ) সাধনার |
| গ) প্রজ্ঞা   | ঘ) ভোগ    |

২। কর্ম অনুযায়ী মানুষ ফল ভোগ করে -

- কুশল কর্মের কুশল ফল
- অকুশল কর্মের ফল অকুশল
- কর্মফল সম্পর্কে বিশ্বাসী হয়ে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i        | খ. i ও ii      |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

কাজল বড়ুয়া পশু-পাখির ব্যবসা করেন। তিনি একদা প্রেমের শিশুসত্ত্বের উদ্দেশ্যে সংহদানের ব্যবস্থা করেন। দীর্ঘদিন ব্যবসা করার পর হঠাৎ তিনি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন। তিনি মৃত্যুর সময়েও উক্ত দানের কথা স্মরণ করেন।

৩। কাজল বড়ুয়া সংহদান চেষ্টা করার কোন সম্পত্তির প্রতিফলন ঘটেছে ?

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| ক) বস্তু সম্পত্তি       | খ) চিত্তসম্পত্তি |
| গ) প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি | ঘ) ভোগ্যসম্পত্তি |

৪। কাজল বড়ুয়ার সংহদানের কুশল চেষ্টা করার লাভ করতে পারেন -

- পূণ্যফল ভোগ
- মহাফল ভোগ
- পাপ মোচন।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii   | খ) i ও iii     |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |



**সৃজনশীল প্রশ্ন :**

- ১। অর্ণব চাকমার মা পক্ষাঘাতজনিত কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ হাসপাতালে শয্যাশায়ী। মায়ের রোগমুক্তির জন্য তিনি নির্দিষ্ট সময়ে ভিক্তুসত্তের আহ্বারের ব্যবস্থা করেন এবং অষ্ট পরিশ্রমের দানও করেন। তাঁর মায়ের প্রতি এবূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখে শ্রুত্রেয় বিহারাধ্যক্ষ দেশনার্য সকলের নিকট তাঁর প্রশংসা করেন।

ক. বৌদ্ধধর্মে দানীয় বস্তু র ক্ষেত্রে প্রাধান্য কয়টি বিষয়ে বিবেচনা করতে হয় ?

খ. মিশ্রদান বলতে কী বোঝায় ?

গ. অর্ণব চাকমার দানের ঘটনাতে দাতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দানের প্রভাবে চিত্তকে পরিশুদ্ধ ও ফলপ্রসূ করতে দাতা-গ্রহীতার বিদূষ জুনিয়া প্রয়োজন – পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তা বিশ্লেষণ কর।

- ২। অন্যের জমি বর্ণা নিয়ে কৃষিকাজ করে রিক্ত চাকমার সংসার চালানো খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। তবে তিনি অত্যন্ত সৎ ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। তাঁর দান করার প্রবল ইচ্ছা থাকার সত্ত্বেও কাজের চাপে পুণ্য কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ হন। একদা কয়েকজন ভিক্ষু পিণ্ডাচারণের উদ্দেশ্যে তার বাড়িতে আগমন ঘটলে তিনি কালবিলম্ব না করে পূর্বের রান্নাকৃত ভাত ও তরকারি দান করেন। এতে তিনি খুবই খুশি হন।

ক. সৌতমবুদ্ধ চেতনাকে কী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন ?

খ. রাজা বেসসান্তর তাঁর পুত্র সন্তানদের দান করলেন কেন ? ব্যাখ্যা কর।

গ. রিক্ত চাকমার দানটি পাঠ্যপুস্তকের কোন কাহিনীর সাথে মিল রয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত দান চেতনায় তাঁর ধর্মীয় জীবনে কীদূপ প্রভাব পড়তে পারে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

**শূন্যস্থান পূরণ কর :**

১. দান পারমী পূর্ণ না করলে . . . লাভ সম্ভব নয়।
২. বোধিসত্ত্ব স্বহস্তে . . . দান করলেন।
৩. রাজা বেসসান্তর অত্যন্ত . . . ছিলেন।
৪. কল্যাণ নদী তীরে বসবাস করত এক . . .।
৫. দানীয় বস্তু . . . প্রকার।

**মিলকরণ :**

তান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর

| বাম                      | ডান                          |
|--------------------------|------------------------------|
| ১. কর্ম অনুযায়ী         | বিচার-বিবেচনা করা            |
| ২. দানীয় বস্তু সম্বন্ধে | মানবীয় গুণ                  |
| ৩. দান একটি মহৎ          | ফল প্রাপ্ত করতে হয়          |
| ৪. বৃক্ষ চতনাকে          | প্রীতি অনুভব করলেন           |
| ৫. বেহিসত্ত্ব দানজনিত    | কর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন |

**সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

১. দানের ক্ষেত্রে কী কী বিবেচনা করতে হয়?
২. 'কাদান' কী?
৩. দানশীল ব্যক্তি সমাজে কীভাবে মূল্যায়িত হয়?

**রচনামূলক প্রশ্ন :**

১. দানের ধর্মীয় গুরুত্ব আলোচনা কর।
২. তিন প্রকার দানের বর্ণনা দাও।
৩. দানের উপযুক্ত পাত্র কে? আলোচনা কর।

## পঞ্চম অধ্যায়

### সূত্র ও নীতিগাথা

তথাগত বৃন্দ বিভিন্ন সূত্র ও নীতিগাথা ভাষ্যের মাধ্যমে ধর্মোপদেশ দান করতেন। সূত্রপটিকের বিভিন্ন গ্রন্থে এসব সূত্র ও নীতিগাথা পাওয়া যায়। এসব সূত্র ও নীতিগাথা মানুষের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন করে এবং পরিবার ও সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই অধ্যায়ে আমরা দুটি সূত্র পাঠ করব। সূত্র দুটি হলো পরাভব সূত্র ও কলহ বিবাদ সূত্র।

#### এ অধ্যায় শেষে আমরা -

- \* পরাভব সূত্র এবং কলহ বিবাদ সূত্রের পটভূমি বর্ণনা করতে পারব।
- \* মানব জীবনের পরাজয় ও কলহ বিবাদের কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- \* পরাভব এবং কলহ বিবাদ সূত্র পাঠে কীভাবে নৈতিক জীবন গঠন করা যায় তা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- \* পরাভব ও কলহ-বিবাদ হতে বিরত থাকার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারব।

#### পাঠ : ১

### পরাভব সূত্রের পটভূমি

একবার দেবভাগবের অনুরোধে তথাগত বৃন্দ মানুষ ও প্রাণীর কীসে মজ্জল হয় তা বর্ণনা করে মজ্জল সূত্র দেননা করেন। দেবতারা মজ্জলসূত্র শুনে সন্তুষ্ট হন। কিন্তু তাঁরা চিন্তা করলেন, আমরা কেবল মজ্জল সম্পর্কেই জেনেছি। কেন মানুষের পরাভব বা অমজ্জল হয় তা জানি না। অতপর তাঁরা সিম্বান্ত নিলেন, পুনরায় বৃন্দের কাছে গিয়ে কেন মানুষের পরাভব হয় তা জানবেন। এবূণ ভেবে তাঁরা পুনরায় বৃন্দের নিকট গেলেন। তখন তথাগত বৃন্দ স্নাত্তীর অন্থাপিড়িকের জেতবন বিহারে বসবাস করছিলেন। তাঁরা বৃন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে অস্তিবাদপূর্বক মানুষের পরাভবের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ভগবান বৃন্দ মানুষের পরাভবের সঠিক কারণগুলি যে সূত্রে উল্লেখ করেন তার নাম 'পরাভব সূত্র'। সূত্রটি 'খুদ্ধক নিকায়ে'-এর অন্তর্গত সুত্তনিপাত গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

#### অনুশীলনমূলক কাজ

পরাভব সূত্রটি বৃন্দ কাদের উদ্দেশে দেননা করেছিলেন?

পরাভব সূত্র কোন গ্রন্থে বর্ণিত আছে?



বৃন্দ্র দেবতাদের উদ্দেশ্যে পরাভব সূত্র বৈশনা করাছেন

পাঠ : ২

পরাজব সূত্র (গালি ও বাংলা)

১। সুবিজ্ঞানো ভবং হোতি, অবিজ্ঞানো পরাভবো,

ধম্মকামো ভবং হোতি, ধম্মদেসসী পরাভবো।

বাংলা অনুবাদ : জ্ঞানী ব্যক্তির জয় হয় এবং অজ্ঞানীর পরাজয় ঘটে, ধর্মদুরাগীর জয় হয় কিন্তু ধর্ম বিধেবীর পরাজয় হয়।

২। অসত্তসুস পিখা হোত্তি, সত্তে ন কুব্বতে পিথং,

অসত্তং ধম্মং প্রোচেতি, তং পরাভবতো মুখং।

বাংলা অনুবাদ: অসৎ যার প্রিয়, সৎ যার অপ্রিয়, এবং অধর্ম যাব প্রিয় তার পরাজয় হয়ে থাকে।

৩। নিন্দাসীলি সভাসীলি, অনুট্টীতা চ যো নরো,

অলসো কেবলমংগ্গানো, তং পরাভবতো মুখং।

বাংলা অনুবাদ: যে খুব দুর্মান, বশুদের সংগে অনেককণ গল্প করে সময় কাটায়, অলস, উদামহীন ও রাগী তার পরাজয় হয়ে থাকে।

৪। যো মাতরং বা পিতরং বা, জিন্মকং গত্যোকমং,

পহুসত্তো ন ভবতি, তং পরাভবতো মুখং।

বাংলা অনুবাদ: যে নিজে সুখে থেকে বৃক্ষ পিতামাতার ভরণ-পোষণ করে না তার পরাজয় হয়ে থাকে।

৫। যো ব্রাহ্মণং বা সমনং বা, অংগ্গং বা পি বণিকং,

মুসাবাদেন ব্বেজ্জতি, তং পরাভবতো মুখং।

বাংলা অনুবাদ: যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, শ্রমণ অথবা অন্য অসহায় লোককে মিথ্যা কথা বলে বকনা করে তার পরাজয় ঘটে।

৬। পহুতবিত্তো পুরিসো- সহিরংগেগো সভোজনো,

একো ভুজ্জতি সাদুনি- তং পরাভবতো মুখং।

বাংলা অনুবাদ: যার অনেক ধনসম্পত্তি থাকতেও অনেকে বিন্দুমাত্র দান করে না বা দেয় না, নিজেই একা ভোগ করে তার পরাজয় ঘটে থাকে।

৭। জাতিথম্মো ধনথম্মো, গোত্তথম্মো চ যো নরো,

তং এত্তিৎ অতিমংগ্গে এত্তি, তং পরাভবতো মুখং।

বাংলা অনুবাদ: যে জাতিগর্বে, ধনগর্বে ও কুলগর্বে নিজের জাতিদের অবজ্ঞা করে তার পরাজয় হয়ে থাকে।

৮। ইথীহুত্তো সুব্ধুত্তো, অকুখুত্তো চ যো নরো,

লম্বং লম্বং বিন্যাসেতি, তং পরাভবতো মুখং।

বাংলা অনুবাদ: যে ব্যক্তি পরস্পরীতে আসক্ত হয়ে এবং মানক ও জুয়া খেলার মত্ত হয়ে যা রোজগার করে তা ব্যয় করে তার পরাজয় ঘটে।

৯। অতীত যোঝনো পোসো, আনেতি তিস্করল্লখনিং,  
তসসা ইস্সা ন সুপতি, তং পরাতবতো মুখং।

বাংলা অনুবাদ: যে বৃন্দ তরুণী কন্যা বিবাহ করে এনে, সার্থ্য্য বিনিদ্র রজনী যাপন করে পরাজয়ের কারণ হয়।

১০। ইথী সোভিং বিকিরিণিং, পুত্রিসং বাপি অমিনং,  
ইসদরিঘনিং ঠেপেত্তি, তং পরাতবতো মুখং।

বাংলা অনুবাদ: মাদকসেবনকারী, অনর্থক অর্থ ব্যয়কারী স্ত্রী বা পুত্রকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিযুক্ত করলে তা পরাজয়ের কারণ হয়।

১১। অপ্পভোষো মহাতপ্পহো, ঋথিযে জাযতে কুলে,  
সো চ রজ্জং পঞ্চযতি, তং পরাতবতো মুখং।

বাংলা অনুবাদ: যে কত্রিয় কুলে জন্ম নিয়েও দরিদ্র ও হীনবল অথচ তার আকাঙ্ক্ষা খুব বেশি এবং এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে সে রাজ্য পাওয়ার ইচ্ছা করে তার পরাজয় ঘটে থাকে।

১২। এতে পরাতবে লোকো, পত্তিতো সমবেক্খিয,  
অরিযদসসন সম্পন্নো, সলোকং ভজতে সিবন্তি।

বাংলা অনুবাদ: পরাজয়ের ঐসব কারণ বুঝে যিনি ঐ সকল কর্ম বর্জন করে কুশল কাজসমূহ সম্পাদন করেন তার কখনো পরাজয় হয় না।

### অনুশীলনমূলক কাজ

পরাজয়ের কারণগুলি দলগত আলোচনার পরে উপস্থাপন কর।

## পাঠ : ৩

### পরাতব সূত্রের তাৎপর্য

পরাতব বলতে এই সূত্রে পরাজয় বা পতন বোঝানো হয়েছে। নানা অকুশলকর্ম করার জন্য মানুষের পতন বা ক্ষতি হয়ে থাকে। ভাগ্য দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ সতীকরণের পরাজয় বা পতন চিহ্নিত করতে পারে না। অজ্ঞতার কারণে অনেক সময় যাকে পরাজয় মনে করে তা আসলে পরাজয় নয়। অসৎ সজ্ঞার সঙ্গে মিশতে না দিয়ে অনেক সময় মনে রাখা হয়, নিজেকে অজ্ঞতাবশত পরাজিত মনে হয় কিন্তু অসৎ সঙ্গেই পরাজয় ঘটায়। সংস্কার মানুষের উপকার সাধন করে। অসৎ ব্যক্তির পরাজয় ঘটে, জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারে না। জ্ঞানী ও ধার্মিক ব্যক্তির সর্বত্র জয় হয়, সাফল্য অর্জিত হয়। অকুশল বা অসৎভাবে অর্জিত সম্পদ মানুষের পরাজয়।

ঘটায়। মানক সেবন করলে অর্থ, স্বাস্থ্য, সম্মান ও জীবন নাশ হয়। মানকসেবীর পরাজয় বা পতন ঘটে। অন্যায় শোভা ও আকাঙ্ক্ষা পরাজয়ের কারণ। এভাবেই বুদ্ধ পরাজয়ের যথোপযুক্ত কারণসমূহ ‘পরাত্তব সূত্রে’ ব্যাখ্যা করেছেন। জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব পরাজয়ের ঐ সব কারণসমূহ বর্জন করে চলেন, ফলে তাঁদের সাফল্য বা জয় হয়। আমাদেরও উচিত এই সূত্রে বর্ণিত পরাজয়ের কারণসমূহ বর্জন করে কুশলকর্ম সম্পাদনপূর্বক সম্প্রদেয় জীবন পরিচালনা করা। এতে আমাদের জীবনে সাফল্য আসবে, তন্মাত্রেরেও এই কুশল কর্মের ফলে উন্নত জীবন লাভ করা যাবে। কুশল কর্মের ফল শূন্য নিজেই নয়, তার উত্তরাধিকারীণও এবং সমাজ ও সকল প্রাণী ভোগ করে। পরাত্তব সূত্রের উপদেশগুলো মানুষের নৈতিক জীবন গঠনে পুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই, পরাত্তব সূত্রের শিক্ষা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

**অনুশীলনমূলক কাজ**  
পরাত্তব সূত্র কেন পুরুত্বপূর্ণ

**পঠ : ৪**

**কলহ-বিবাদ সূত্র**

মানুষ যে সকল অকুশল বা মন্দ কাজ করে তার মধ্যে কলহ-বিবাদ অন্যতম। কীভাবে কলহ-বিবাদ বর্জন করে ভালো কাজ করা যায় তা জ্ঞানীর জন্য কলহ-বিবাদের কারণ জানা আবশ্যিক। সেজন্য তত্ত্বাবদ বুদ্ধ দেবতাদের অনুরোধে কলহ-বিবাদ সূত্রটি দেশনা করেন। এখানে সূত্রটি পালি ও বাংলায় বর্ণিত হলো।

**কলহ বিবাদ সূত্র (পালি ও বাংলা)**

১। কুতোপহৃত্তা কলহা বিবাদা, পরিদেবসোকা সহ মূঢ়া চ;

মানাতিমানা সহপেপুনা চ, কুতোপহৃত্তা তে তসিঞ্জ ব্রহি।

**বাংলা অনুবাদ:** কোথা হতে কলহ, বিবাদ, পরিদেবন, শোক, মাৎসর্য, গর্ব, আত্মপ্রশংসা, শৈশুনা ইত্যাদির সৃষ্টি হয়- তা দূর্য করে প্রকাশ করুন।

২। পিষশ্পহৃত্তো কলহা বিবাদা, পরিদেবসোকা সহমাচ্ছর চ;

মানাতিমানা সহপেপুনা চ, মচ্ছেরয়ুক্তো কলহা বিবাদা,

বিবাদ জাতেসু চ পেসুন্নমি।

**বাংলা অনুবাদ:** রিয়কট হতে কলহ, বিবাদ, শোক, মাৎসর্য, গর্ব, আত্মপ্রশংসা, শৈশুনা ইত্যাদির সৃষ্টি হয়, কলহ ও বিবাদ মাৎসর্যের সাথে যুক্ত, বিবাদ থেকে শৈশুনের জন্ম হয়।

৩। পিয়া যু লোকসিং কুতেনিদানা, যে চাপি লোভা বিচরতি লোকে;

অসা চ নিট্টা চ ইতেনিদানা, যে সম্প্রায়ায নরসস হোত্তি।

**বাংলা অনুবাদ:** জগতে কীভাবে স্রিয়কল্প সমূহের উৎপত্তি হয়? জগতে বিদ্যমান লোভ, বাসনা ও পূর্ণতা, যা হতে মানুষের ভবিষ্যত জন্ম নির্ধারিত হয়, এসবের উৎপত্তি কীভাবে হয়?

৪। ছন্দনিদানানি পিয়ানি লোকে, যে চাপি লোভা বিচরতি লোকে;

অসা চ নিট্টা চ ইতেনিদানা, যে সম্প্রায়ায নরসস হোত্তি।

**বাংলা অনুবাদ:** জগতে ছন্দ (ইচ্ছা) নিদান (কারণ) হতে প্রিয় বস্তু সমূহের সৃষ্টি হয়। সংসারে যার সাহায্যে মানুষের ভবিষ্যত নির্ধারিত হয়, সেই লোভ, বাসনা ও পূর্ণতা – এ সবই ছন্দ (ইচ্ছা) হতে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৫। ছন্দো নু লোকসিং কুতেনিদানো, বিনিচ্ছ্যা চাপিং কুতেপল্লতা,

কোথো মোসবজ্জহ কথংকতা চ, যে বাপি ধম্মা সমধেন বৃত্তা।

**বাংলা অনুবাদ:** জগতের ছন্দ (বাসনা) কোন কারণের দ্বারা উৎপন্ন হয়? বিনিচ্ছয় কিছুতে উৎপন্ন হয়; ক্রোধ, মিথ্যাকথা, সন্দেহ এবং শ্রমণের সাহায্যে কথিত ধর্মসমূহের উৎপত্তি কোথা হতে হয়?

৬। সাতং অসাতত্তি যমাত্ত লোকে, তুম্মণিসঙ্গায় পহেতি ছন্দো;

বুপেসু দিহা বিত্তবং শুব্বজ, বিনিচছয়ং কুপতি জত্ত লোকে।

**বাংলা অনুবাদ:** জগতে যা আনন্দ (সাত) এবং অপ্রীতিকরতা (অসাত) বলা হয়, তার মাধ্যমেই বাসনার উৎপত্তি হয়; সমস্ত বৃণসমূহের ক্ষয় ও সৃষ্টি দর্শন করে মানুষ সংসারে সংকল্প করে থাকে।

৭। কোথো মোসবজ্জহ কথংকতা চ, এতেপি ধম্মা ক্ষমের সত্তে;

কথংকখী এগানপথায় সিব্বখে, এত্তা পবুহি সমধেন ধম্মা।

**বাংলা অনুবাদ:** ক্রোধ, মিথ্যাকথা এবং সন্দেহ – এরাও দু' প্রকার ধর্ম (আনন্দ ও অপ্রীতিকরতা) হতে উৎপন্ন হয়, সংযোজিত জ্ঞানমার্গে শিক্ষিত হবেন, জ্ঞান দ্বারাই শ্রমণ কর্তৃক ধর্মসমূহে যোগিত হয়েছে।

৮। সাতং অসাতত্ত্ব কুতেনিদানা, কসিং অসত্তে ন ভবত্তি হেত্তে;

বিত্তবং শুব্বজাপি যমেত্তমথং, এত্তং মে পবুহি যতেনিদানা।

**বাংলা অনুবাদ:** আনন্দ ও অপ্রীতিকরতার উৎপত্তির কারণ কোথায়, কোন বস্তু যা ভাব্য হলে এদের উৎপত্তি হয় না? ক্ষয় ও সৃষ্টি বৃণ সংস্কার কোন কারণ হতে উৎপন্ন হয়, প্রকাশ করুন।

৯। ফসসনিদানং সাতং অসাতং, ফসসে অসত্তে ন ভবত্তি হেত্তে;

বিত্তবং শুব্বজাপি যমেত্তমথং, এত্তং মে পবুহি ইতেনিদানাং।



**বাংলা অনুবাদ:** স্পর্শের কারণ হতে আনন্দ ও অপ্রীতিকরতার সৃষ্টি হয়; স্পর্শের অভাব হলে তাদের সৃষ্টি হয় না; ধ্বংস ও সৃষ্টি কূপ সংস্কারও তা থেকেই উৎপন্ন হয়।

১০। ফস্বেসো নু লোকস্মিং কুতোনিদানো, পরিগ্গহা ঠপি কুতোপহুতা;

কিস্মিং অসন্তে ন মমত্তং নস্মি, কস্মিং বিভুতে ন ফুসন্তি ফসসা।

**বাংলা অনুবাদ:** জগতে স্পর্শের উৎপত্তি কোথায়, আসক্তি কী কারণে উৎপন্ন হয়, কোন যজ্ঞ রূপে অতাবে মমত্বের অস্তিত্ব নেই, কীসের নাশ হলে স্পর্শসমূহ স্পর্শে বিরত হয়?

১১। নামধরুপপ্প পটিচ্চ ফস্বেসো, ইচ্ছা নিদানানি পরিগ্গহহানি;

ইচ্ছায় সত্তা ন মমত্তং অস্মি, নুপে বিভুতে ন ফুসন্তি ফসসা।

**বাংলা অনুবাদ:** নাম রূপের কারণ হতে স্পর্শ সৃষ্টি হয়, ইচ্ছানিদানই আসক্তির উৎপত্তির কারণ; ইচ্ছা না থাকলে মমত্বের অস্তিত্ব থাকে না, রূপের নাশ হলে স্পর্শ সমূহ স্পর্শ করতে পারে না।

১২। কথং সমেতসু বিভোতি রূপং, সুখং সুক্ষণস্মি কথং বিভোতি;

এতং মে পব্রুহি যথা বিভোতি তং জানিযামাতি মে মনো অহু।

**বাংলা অনুবাদ:** কী রকম অবস্থায় রূপের নাশ হয়, সুখ ও দুঃখের ধ্বংস কীসে হয়? এর ক্ষয় কী রূপে হয় তা প্রকাশ করুন, আমরা জেনে নেব, এই আমাদের মনস্কাম।

১৩। ন সঞ্ছএসএঃঞী ন বিসএঃঞসএঃঞী,

নোপি অসএঃঞী ন বিসুত্তসএঃঞী,

এবং সমেতসু বিভোতি রূপং,

সএঃঞানিদানা হি পপ্পজসত্তা।

**বাংলা অনুবাদ:** ইন্দ্রিয়সমূহ সংজ্ঞায়ুক্ত হবে না, মিথ্যা সংজ্ঞায়ুক্তও হবে না, সংজ্ঞাহীনও হবে না, সংজ্ঞা পরিত্যক্তও হবে না, এভাবে অবস্থান করলে রূপের নাশ হয়, প্রপঞ্চসমূহ সংজ্ঞার কারণেই উৎপন্ন হয়ে থাকে।

১৪। যং তং অপুচ্ছিমুহ তকিণ্ণী নো, অএঃঞং তং পুচ্ছাম স্তমিজ্জ ব্রুহি;

এত্তাবত্তরং নু বদন্তি হেকে যক্খসুস সুম্ভিং ইব পিত্তসে;

উদাহু অএঃঞস্মি বদন্তি এত্তো।

**বাংলা অনুবাদ:** আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর উত্তর আপনি দিয়েছেন; আপনাকে এখন অন্য প্রশ্ন করব, তা প্রকাশ করুন; এই জগতে কোনো পণ্ডিত চিত্ত সুম্বিধকেই কি শ্রেষ্ঠ জিনিস বলেন না, অথবা তাঁরা কি অন্যরকম বলেন?

১৫। এতাবত'গ্লানি বদন্তি হেবে, বকসস সৃষ্টি ইথ পতিসে;

তেসপেনেক সমথং বদন্তি, অনুশাসিসে কুলা বদনা।

**বাংলা অনুবাদ:** কোন কোন পতিতলোক চিত্তশুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ জিনিস বলে থাকেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ উচ্ছেদ হয়ে যাওয়াকে শ্রেষ্ঠ মনে করে থাকেন, জ্ঞানীগণ স্বাস্থ্যসমূহের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হওয়াকেই শ্রেষ্ঠ বলে থাকেন।

১৬। এতে চ এত্য়া উপনিসৃতিতি, এত্য়া মুনীনিসৃথে গো বিমংসী,

এত্য়া বিমুক্তো ন বিবাদ 'মেতি, ভবান্তবাস ন সমেতি ইত্তেতি।

**বাংলা অনুবাদ:** এদের 'অশ্রয়ধীন' জেনে, অশ্রয়সমূহ পরিত্যক্ত হয়ে, বিমুক্ত হয়ে, অবৈশ্বক্যকারী মুনি বিবাদে নিমুক্ত হন না, জ্ঞানীলোক বার বার অনুগ্রহণ করেন না।

## পাঠ : ৫

### কলহ-বিবাদ সূত্রের তাৎপর্য

কলহ-বিবাদ সূত্রে আমরা বুকের ধর্মের নূর দর্শন সম্পর্কে জানতে পারি। এই সূত্রে নিহিত আছে কলহের কারণ ও কলহ হতে মুক্তির উপায়। এই সূত্রটির যেমন আছে অধ্যাত্মিক তাৎপর্য তেমন আছে জাগতিক বিষয়ে নিক নির্দেশনা। প্রিয়বস্তু হতে কলহ, বিবাদ, শোক, মাৎসর্য, গর্ব, আত্মপ্রশংসা, পৈশুন্য ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। জাগতে বিদ্যমান লোভ ও বাসনা থেকে প্রিয়বস্তু উৎপন্ন হয়। ইচ্ছা থেকেই লোভ বাসনা উৎপন্ন হয়। আনন্দ (সাত) এবং অপ্রীতিকরতা থেকে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। স্পর্শের কারণ হতে আনন্দ ও অপ্রীতিকরতার সৃষ্টি হয়। নাম রূপের কারণ হতে স্পর্শ সৃষ্টি হয়। ইচ্ছানিদানই আসক্তি উৎপত্তির কারণ। ইন্দ্রিয়সমূহ সংজ্ঞায়ুক্ত হবে না, মিথ্যা সংজ্ঞায়ুক্তও হবে না, সংজ্ঞাহীনও হবে না, সংজ্ঞা পরিত্যক্তও হবে না, এভাবে অবস্থান করলে রূপের নাশ হয়। রূপের নাশ হলে স্ব স্বসমূহের বিনাশ ঘটে। ফলে কলহ বিবাদ উৎপন্ন হয় না।

জ্ঞানী ব্যক্তির বাসনা ক্ষয় করে নির্বাণের পথে এগিয়ে যান। ফলে জ্ঞানীরা নির্বাণ সাধাৎ করতে সক্ষম হন এবং পুনরায় অনুগ্রহণ করেন না। জন্ম নিরোধ হলে দুঃখের নিরোধ হয়। এই সূত্র আমাদের কলহের কারণ যেমন নির্দেশ করে তেমনিই কলহ হতে বিরত থাকার উপায়ও নির্দেশ করে। ফলে এ সূত্র অনুসরণ করে আমরা শান্তিপূর্ণ জীবন গঠনের শিক্ষা লাভ করতে পারি। তাই কলহ-বিবাদ সূত্রের শিক্ষা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

#### অনুশীলনীমূলক প্রশ্ন

প্রিয়বস্তু হতে কী কী উৎপন্ন হয় বল

কোষ, মিথ্যাকথা এবং সন্দেহ কেন উৎপন্ন হয়?

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কীসের দ্বারা মানুষের উপকার সাধন হয় ?

- |               |            |
|---------------|------------|
| ক) সংপথ       | খ) সংসজ্জা |
| গ) সংজ্ঞাবিকা | ঘ) সংজ্ঞান |

২। অলস ব্যক্তির পরাজয় ঘটে -

- কর্মের প্রতি অমনোযোগী হওয়ায়
- উদ্যমহীন হওয়ায়
- বেশি ঘুমানোর কারণে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক) i        | খ) i ও ii      |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

চন্দ্রমোহন জমিদারের দুই পুত্র। দুই পুত্রের মধ্যে স্বপন চাকমা প্রায়ই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অন্যদের সাথে প্রতারণা করত। অপরদিকে অপরূপ চাকমা আদর্শবান ক্রিকেটার হিসেবে এলাকার উন্নয়নে এবং জাতি-গুবীজনের সেবায় এগিয়ে আসত।

৩। উদীপকের ঘটনাটি কোন সূত্রের ইজিত বহন করে ?

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| ক. পরাভব সূত্র | খ. কলহ-বিবাদ সূত্র     |
| গ. মজ্জিমসূত্র | ঘ. করণীয় মৈত্রী সূত্র |

৪। উক্ত সূত্রে স্বপন চাকমার আচরণে লজিত হয়েছে -

- নৈতিকতার
- উন্নত জীবনের
- সৎ কর্মের

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক) i        | খ) i ও ii      |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ঘটনা-১ : টুটুল মার্মা পেশার চাকরিজীবী। তিনি মা-বাবাকে ভরনপোষণ ও সেবা করেন। পাশাপাশি তিনি সাধ্যমতো শ্রমণ ও ভাস্তেদেরকে দান দেন।

ঘটনা-২ : গুইকাচিং মার্মা ঐক্যিক সূত্রে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী। তিনি বশু-বান্ধবের সাথে গল্প করে এবং মাদক সেবন ও জুয়া খেলে সম্পত্তির বিনাশ ঘটায়।

ক. কারা মজলসূত্র শূনে সবুজী হয় ?

খ. কলহ-বিবাদ সূত্রের শিক্ষা কী ? ব্যাখ্যা কর।

গ. ঘটনা-১ এ বর্ণিত বিষয়টি কোন সূত্রের ইজিত বহন করে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ঘটনা-২ এ উক্ত সূত্রের আংশিক পরাজয়ের কারণ রয়েছে - তুমি কী এ বক্তব্যটির সাথে একমত ? যুক্তি দাও।

২। প্রতিবেশী সুমিতা চাকমার সাথে রমিতা দেওয়ানের প্রায়শই গৃহপালিত হাঁস-মুরগির ধান খাওয়াকে কেন্দ্র করে ঝগড়া হতো। ঝগড়ার সূত্র ধরে উভয়ের মিথ্যা এবং সন্দেহের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এক পর্যায়ে অসীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হয়। এমনতাবস্থায় এক ভিক্স এসে তাদের উদ্দেশ্যে কলহ-বিবাদ সূত্রের একটি গাথা শোনান।

ক. 'পরাতব সূত্রটি' খুন্দক নিকায় এর কোন গ্রন্থের অন্তর্গত ?

খ. সূত্র ও নীতিগাথা বলতে কী বোঝায় ?

গ. রমিতা ও সুমিতার বিবাদের বিষয়টি কলহ বিবাদ সূত্রের কোন গাথার প্রতিফলন ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত গাথার মর্মার্থ দুই প্রতিবেশীর বিবাদ নিরসনে কী ভূমিকা রাখতে পারে বলে তুমি মনে কর। ব্যাখ্যা কর।

### শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. পরাতব শব্দের অর্থ.....।

২. যে নিজে সুখে থেকে বৃশ্চ পিতামাতাকে ভরণ পোষণ করে না তার .....হয়ে থাকে।

৩. সংসজ্ঞ ব্যক্তির প্রকৃত .....সিদ্ধ করে।

৪. মাদক সেবীর .....ঘটে।

৫. জানী লোক বারবার ..... করেন না।

**মিলকরণ :**

ডান পাশ থেকে শব্দ বা ব্যাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর

| বাম                             | ডান                                      |
|---------------------------------|--|
| ১. অন্য নিরোধ হলে               | জন্মসমূহের বিনাশ ঘটে                     |
| ২. দুঃখের মার্শ হলে             | দুঃখের নিরোধ হয়                         |
| ৩. জানী ব্যক্তির                | পরাজিত মনে হয়                           |
| ৪. নিজেকে অজ্ঞতাবশত             | বাসনা ক্ষয় করে নির্বোধের পথে এগিয়ে যান |
| ৫. নান্দ্য অকুশল কর্ম করার জন্য | মানুষের পতন বা ক্ষতি হয়ে থাকে           |

**সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

১. ইথী সোত্তিং বিকিরনিং, পুরিসংঘোপি তদিনং,  
ইসসরিসং ঠশেতি, তং পরাভবতো মুচং । - বাংলায় লেখ ।
২. পরাভব সূত্র অনুযায়ী কুশল কর্মের ফল সংক্ষেপে লিখ ।
৩. কলহ-বিবাদ সূত্রের শিক্ষা বর্ণনা কর ।

**রচনামূলক প্রশ্ন :**

১. পরাভব সূত্র পাঠ করে কীভাবে নৈতিক জীবন যাপন করতে হয় আলোচনা কর ।
২. কলহ-বিবাদ সূত্র অনুযায়ী জানী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর ।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### পারমী

পূর্ববর্তী শ্রেণিতে বিভিন্ন সময়ে আমরা ‘পারমী’ শব্দটি পড়েছি। বৌদ্ধধর্মে পারমীর গুরুত্ব অপরিমীম। কারণ বুদ্ধত্ব ও নির্বাণ লাভ করতে হলে পারমী অনুশীলন করে চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধন করতে হয়। পৌত্তম বুদ্ধ বোধিসত্ত্বরূপে ৫৫০ বার জন্মগ্রহণ করেন। প্রতিটি জন্মে তিনি পারমী পূর্ণ করে জীবনের উৎকর্ষতা সাধনপূর্বক বুদ্ধত্ব লাভের পাথে অগ্রসর হন। এ অধ্যায়ে আমরা পারমী সম্পর্কে পড়ব।

এই অধ্যায় শেষে আমরা -

- \* পারমীর পরিচয় ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব।
- \* দশ পারমী বর্ণনা করতে পারব।
- \* পারমীর তাৎপর্য ব্যাখ্যান করতে পারব।

### পাঠ : ১

#### পারমী পরিচিতি

‘পারমী’ শব্দের সাধারণ অর্থ হলো : পূর্ণতা, সমাপ্ততা, সম্পূর্ণতা, প্রকৃষ্ট কৌশল, গুণ, সম্পূর্ণ গুণ বা জ্ঞান, উন্নত অবস্থা, স্বকার্যের পূর্ণতা সাধন, সমর্থতা, পারমিতা ইত্যাদি। সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়েছে এরূপ বৈশিষ্ট্য বা গুণ অর্থে পারমী শব্দের প্রয়োগ হয়। উৎকর্ষতা সাধন বা পরিশুদ্ধিতা অর্জনের জন্য যে সাধনা বা সংকল্পের অনুষ্ঠান তা-ই পারমী। বৌদ্ধধর্মে মানবতার পূর্ণ বিকাশ বা চারিত্রিক উৎকর্ষতা সাধনের জন্য যে সাধন প্রণালী নির্দেশ করা হয়েছে তা পারমী নামে পরিচিত। এ সাধন প্রণালীর মাধ্যমে বুদ্ধত্ব লাভ করা সম্ভব। বুদ্ধত্ব লাভে অভিলাষী বোধিসত্ত্বগণকে পারমী পূর্ণ করতে হয়। খেরবাদ বৌদ্ধধর্ম মতে, পারমী দশ প্রকার, যা দশ পারমিতা নামেও পরিচিত। যথা :

- ১) দান পারমী
- ২) শীল পারমী
- ৩) নৈস্ক্রম্য পারমী
- ৪) প্রজ্ঞা পারমী
- ৫) বীর্য পারমী
- ৬) ক্ষান্তি পারমী
- ৭) সত্য পারমী
- ৮) অবিষ্টান পারমী
- ৯) মৈত্রী পারমী
- ১০) উপেক্ষা পারমী

পারমীসমূহ প্রত্যেকটি তিনটি স্তরে বিভক্ত। যেমন: উপপারমী, পারমী এবং পরমার্থ পারমী। এভাবে পারমী ত্রিশ প্রকার। বোধিসত্ত্বগণ জন্মজন্মান্তরে এই ত্রিশ প্রকার পারমিয়ার পূর্ণতা সাধন করে শেষ জন্মে বোধি লাভ করে বুদ্ধ হয়ে থাকেন। জগত দুঃখে পরিপূর্ণ। দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করার একমাত্র পথ হলো নির্বাণ সাধ্যত বরা। নির্বাণ সাধ্যত করতে হলে অর্হন্ত লাভ করতে হয়। অর্হন্ত প্রাপ্তির জন্য জন্মজন্মান্তরে পারমী পূর্ণ করতে হয়।

নিচে পৌত্তম বুদ্ধের বোধিসত্ত্বকালীন জীবনের একটি কাহিনী তুলে ধরা হলো। এ কাহিনী থেকে আমরা পারমী সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি।



দীপংকর বুদ্ধ ও সুমেধ তপস

জগত জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ। মানুষ ও প্রাণিকুল জন্মগ্রহণ করে কর্মফল অনুযায়ী জীবন যাপন করে মৃত্যুরণ করে এবং পুনরায় কর্মফল অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করে। এভাবে তাঁকে জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর আবর্তে ঘুরতে হয় অনন্তকাল। বুদ্ধগণ জগতের দুঃখময়তা অনুধাবন করে দুঃখ মুক্তির পথ নির্দেশ করেন। সহজে বুদ্ধ হওয়া যায় না। এজন্য জন্মজন্মান্তরে কঠোর সাধনা ও বহু কুশল কর্ম সম্পাদন করতে হয়। বুদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ ও সংকল্পবদ্ধ হতে হয়। পৌত্তম বুদ্ধ একজনো অমরাবতী নগরে জ্ঞানী তপস বুপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল সুমেধ তপস। ঐ সময় দীপংকর বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দীপংকর বুদ্ধ অমরাবতী নগরে আসবেন শুনে সেখানে তাঁকে বরণ করার জন্য সাজ সাজ সব পাড় গেলে। নগরকে নানাভাবে সজ্জিত করা হলো। সুমেধ তপস জানতে পারলেন তথাগত বুদ্ধ আসছেন। তিনি বুদ্ধ দর্শনের

আনন্দে শিহরিত হলেন। কীভাবে অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী বৃন্দকে শ্রদ্ধা জানাবেন তা ভাবতে শুরু করলেন। বৃন্দ আসছেন! যত নিকটবর্তী হচ্ছেন সুমেধ তাপস ততই পুলকিত হয়ে ভাবছেন তিনি কী করতে পারেন। তিনি লক্ষ করলেন বৃন্দের আগমন পথের এক অংশ কর্মমাক্ত হয়ে আছে। তিনি ভাবলেন, বৃন্দকে এই কাদায় পা রাখতে দেয়া যায় না। তিনি ঐ পথটুকুতে শুরুর পড়লেন। বৃন্দকে অনুপ্রবেশ করলেন তিনি যেন তাঁর দেহের উপর দিয়ে হেঁটে যান। সুমেধ তাপসের এবূধ বৃন্দতত্ত্বি সেবে সমবেত জনগণ ‘সাহুবাদ’ প্রদান করল। বৃন্দও বিমোহিত হলেন।

দীপংকর বৃন্দের কাছে সুমেধ তাপস একটি প্রার্থনা করলেন, তিনি যেন ‘বৃন্দ’ হতে পারেন। দীপংকর বৃন্দ আশীর্বাদ করে প্রার্থনা অনুমোদন করলেন। সুমেধ তাপস ঐদিন থেকে ভবিষ্যতে বৃন্দ হওয়ার জন্য পারমী পূর্ণ করার সংকল্প গ্রহণ করলেন। শুরু হয়ে গেল তাঁর পারমী পূরণের জন্য জন্মান্তর ব্যাপী কুশলকর্ম সম্পাদনের যাত্রা। পাঁচশত ঊনপঞ্চাশ বার বোহিসত্ত্ব রূপে জন্মগ্রহণ করার পর শেষ জন্মে কপিলাবন্তুর শাক্য রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এ জন্মেও তাঁকে পারমী পূর্ণ করতে হয়েছে। অবশেষে ছয় বছর কঠোর তপস্যা করে তিনি বৃন্দত্ব লাভ করেন। সুদীর্ঘ পয়তাল্লিশ বছর সর্ব প্রাণীর কল্যাণের জন্য ধর্ম প্রচার করে কুশীনগরের যমক শালবৃক্ষের নিচে পরিনির্বাণ লাভ করলেন। পরিনির্বাণের মাধ্যমে তিনি জন্ম নিরোধ করলেন। এখানে সুমেধ তাপস বৃন্দ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য শপথ গ্রহণপূর্বক জন্মজন্মান্তরে যে সকল কুশলকর্ম সম্পাদন করেছিলেন তা-ই পারমী। বোহিসত্ত্বগণ এভাবে পারমীসমূহ পূর্ণ করে থাকেন।

### অনুশীলনমূলক কাজ

পারমী শব্দের অর্থ কী?

পারমী বলতে কী বোঝ?

দশ পারমী কী কী?

পাঠ : ২

### দশ পারমী

**দান পারমী :** দশ পারমীর মধ্যে দান পারমীর স্থান সর্বোচ্চ। সৌতম বৃন্দ ‘বৃন্দত্ব’ লাভের জন্য দশ পারমীর মধ্যে প্রথম ‘দান পারমী’তেই গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ দান মানুষের ত্রাণ বা রক্ষাকারী। দান দ্বারা মানুষের দুঃখ-দৈন্য দূর হয়। দান স্বর্গের দোপান সূদশ এবং ইহকাল ও পরকালে শান্তিকার সুখ আনয়ন করে। তাই নিরঙ্কুশভাবে দান করে দান পারমী পূর্ণ করতে হয়। নিজের ধন সম্পত্তি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, স্ব-পুত্র এবং জীবন উৎসর্গ করা দান পারমীর পর্যায়ভুক্ত। তাগের পথ মহাপথ। সৌতম বৃন্দ জন্মান্তরব্যাপী এ পথ অবলম্বন করে দান পারমী পূর্ণ করেছেন। তিনি দীপংকর বৃন্দের সময় সুমেধ তাপসরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং বৃন্দত্ব লাভের প্রত্যয়ে দান পারমী পূরণের দৃঢ় সংকল্প করেন। তাই সংসার চক্রের দুঃখ হতে মুক্তি প্রত্যাশী ব্যক্তির দান পারমী পূরণ করা উচিত। দান পারমী তিন প্রকার। যথা : দান পারমী, দান উপ-পারমী এবং দান পরমার্থ পারমী।



**দান পারমী :** ব্যবহারিক জীবনে উন্নত ও উদার চিন্তে অপরের সুখ-শান্তি কামনায় টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি বাহ্যিক বস্তু দান করাকে দান পারমী বলে। তথাগত বুদ্ধ বেসদাস্তর জন্মে ধন-সম্পদ, মজ্জলহস্তি এবং পুত্র-কন্যাসহ স্ত্রী দান করেছিলেন।

**দান উপ-পারমী :** অপরের জীবন রক্ষার্থে নিজের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যেমন, চক্ষু, রক্ত, মাংস প্রভৃতি দান করাকে দান উপ-পারমী বলে। তথাগত বুদ্ধ শিবিরাজ জন্নে চক্ষু দান করেছিলেন। বর্তমানে বাংলাদেশেও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন করা যায় এবং বিভিন্ন ব্যক্তি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করে অনেকের জীবন রক্ষা করেছেন- এবুপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

**দান পরমার্থ পারমী :** অপরের সুখ শান্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করাকে পরমার্থ দান বলা হয়। সাধারণত বাহ্যিক বস্তু দান করা সহজ। জীবন দান করা খুবই কঠিন। জন্মজন্মান্তরে বাহ্যিক বস্তু দানের অভ্যাস না থাকলে জীবন উৎসর্গ করা যায় না। বাহ্যিক বস্তু দান অভ্যাস করার পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জীবন উৎসর্গ করতে সক্ষম হয়।

**শীল পারমী :** শীল শব্দের অর্থ চরিত্র। তথাগত বুদ্ধ চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধনের জন্য যেসব নিয়ম বিবিস্বন্দ্ব করেছেন তা শীল নামে অভিহিত। প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ, মাদক দ্রব্য সেবন ইত্যাদি থেকে বিরত থেকে কুশল কর্ম সম্পাদনের চেনাই শীল। শীল পারমীর পরিসূর্ণতায় মানব জীবন পরিশুদ্ধ হয়। শীলে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির জীবন কলুষহীন এবং নির্বাপি অভিযুক্ত হয়। অপরদিকে দুষ্টশীল ব্যক্তির জীবন বেঁচে থেকেও দুঃখের। সজ্ঞামক ব্যাধির নাম দুঃশীল ব্যক্তি ঘরা পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রে প্রভুত অশান্তি সৃষ্টি হয়। এজন্য তথাগত বুদ্ধ শীলকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে অভিহিত করেছেন। গৌতম বুদ্ধ জন্মজন্মান্তরব্যাপী শীল পারমী চর্চা করেছেন। তিনি বোহিসত্ত্ব অবস্থায় একবার এক কুলপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। একদা তার মাতা এক জটিল রোগে আক্রান্ত হন। বহু চেষ্টা করেও রোগ নিরাময় করা গেল না। অবশেষে বৈদ্য পরামর্শ দিলেন যে, শশকের মাংস খাওয়ালে রোগ নিরাময় হবে। পরামর্শমতো কুলপুত্র বহু কষ্টে জীবিত এক শশক ধরলেন। তখন শশকটি প্রাণভয়ে আতর্জন করতে লাগল। শশকের আতর্জনে কুলপুত্রের চিন্তে মৈত্রী উৎপন্ন হয়। তিনি উপলব্ধি করলেন, আমার মায়ের জীবন আমার নিকট যেমন অতি প্রিয়, তেমনি এ অসহায় প্রাণীটির জীবনও তার কাছে অতি প্রিয়। একজনের জীবন রক্ষার জন্য অন্যের জীবন হরণ করব না - এবুপ ভেবে তিনি শশকটি ছেড়ে দিলেন। এভাবে বুদ্ধ হওয়ার পূর্বে সিদ্ধার্থ গৌতম অসংখ্য জন্মে শীল পারমী পূর্ণ করে চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধন করেছিলেন।

**নৈশ্চম্য পারমী :** নৈশ্চম্য শব্দের অর্থ নির্গমন বা বের হয়ে যাওয়া। সংসার ধর্ম পরিত্যাগ করে বা সংসার হতে বের হয়ে বিশুদ্ধ জীবন যাপন করাকে নৈশ্চম্য বলা হয়। জাগতিক ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করে সংসারের বন্ধন হতে মুক্তির জন্য উৎসাহী হওয়ার ব্রতকে নৈশ্চম্য পারমী বলে। বুদ্ধধর্মে গ্রন্থে নৈশ্চম্য পারমীর স্বরূপ সম্পর্কে এবুপ বর্ণনা আছে : “করাগারে আবদ্ধ বন্ধনজনিত দুঃখে দুঃখিত ব্যক্তি যেমন তথ্য চিরকাল বাস করলেও সেখানে থাকতে ইচ্ছা করে না, মুক্তি লাভের চেষ্টা করে; সেবুপ ভূমিও ভবায়ক করাগারের নাম ভেবে মুক্তির জন্য নৈশ্চম্যাত্মী হও।” বুদ্ধ বলেছেন, গৃহবাস সবধ, প্রজ্যা উন্মুক্ত আকাং তুল্য। প্রব্রজিত ব্যক্তি যা ইচ্ছা করেন তা সহজেই পূর্ণ করতে পারেন। কারণ তিনি সংসারের জটিল বন্ধন থেকে মুক্ত। লোভ-দ্বेष-মোহ মুক্ত। তিনি অল্প লাভে সন্তুষ্ট থাকেন ও উদামশীল হন। বৌদ্ধধর্মে প্রজ্ঞা অবলম্বনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নৈশ্চম্য পারমী পূরণের জন্য প্রথমে স্ত্রী-পুত্র, মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বাড়িঘর, সংসার

সম্পত্তি প্রকৃতি সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়। বোধিসত্ত্বগণ অনাপরিক জীবন যাপন করে নৈজন্ম্য পারমী পূর্ণ করেন এবং নির্বীণ লাভের সাধনার পথে অগ্রসর হন।

**প্রজ্ঞা পারমী :** প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ হলো সত্যক চিন্তা। ভাবনার মাধ্যমে বিষয়বস্তু কে প্রকৃষ্টরূপে জানা। জ্ঞান অর্জনের সাধনাই হলো প্রজ্ঞা পারমী। প্রজ্ঞা পারমী তিন প্রকার। যথা : চিত্তাময় প্রজ্ঞা, প্রত্যময় প্রজ্ঞা এবং ভাবনাময় প্রজ্ঞা। অন্য কারো সাহায্য ব্যতীত পুনঃপুনঃ চিন্তা ভাবনার ফলে যে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় তাকে চিত্তাময় প্রজ্ঞা বলে। সমন্বিতভাবে চিন্তা করলে সকল প্রকার কাজ ও বিদ্যাবস্তু সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যায়। এটিই চিত্তাময় প্রজ্ঞা। তথ্যগত বৃশ্বেশ্বর সর্বজ্ঞতা জ্ঞানকে চিত্তাময় প্রজ্ঞা বলা যেতে পারে। কারণ তিনি আপন অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই এ জ্ঞান অর্জন করেন। শ্রুতিময় প্রজ্ঞা দু'ভাবে অর্জন করা যায়। জ্ঞানী-গুণী বা পুরুষ নিকট শ্রুতি এ জ্ঞান অর্জন করা যায়। আবার অন্যের সাহায্য ব্যতীত গবেষণার মাধ্যমেও এ জ্ঞান লাভ করা যায়। ধ্যান সমাধির দ্বারা অর্জিত জ্ঞানকে ভাবনাময় প্রজ্ঞা বলে। প্রজ্ঞা পারমীর অনুশীলনে ক্রেশনমুহু ধ্বংস হয়। অনিত্য, দুঃখ এবং অনাচ্ছাদ্য সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি অপ্রত্ন হয়। বোধিসত্ত্বগণ প্রজ্ঞা পারমীর অনুশীলন করে অর্হত ও বুদ্ধ লাভের পথে অগ্রসর হন।

**বীর্য পারমী :** বীর্য শব্দের অর্থ হলো বীরত্ব, কর্মশক্তি ইত্যাদি। প্রবল উৎসাহ ও সত্যক প্রচেষ্টার মাধ্যমে কঠিন ব্রত সম্পাদন করাই হচ্ছে বীর্য পারমী। সম্পূর্ণ বৌদ্ধ বুদ্ধ লাভের পূর্বে বুদ্ধ লাভের জন্য কঠোর সাধনা করেছিলেন। তিনি কঠিন সংকল্প করে বলেছিলেন, ‘আমার শরীর অস্থি মজ্জা শুকিয়ে গেলেও আমি বুদ্ধ লাভ না করে এ আসন থেকে উঠব না।’ বুদ্ধ লাভের এ প্রচেষ্টাই বীর্য পারমী। বোধিসত্ত্ব অতীত জন্মে এক কাঠবিড়ালীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। কাঠবিড়ালীরূপী বোধিসত্ত্ব তখন নদীর ধারে এক বটবৃক্ষে বসবাস করত। সেখানে তার দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। একদিন বাচ্চা দুটি নদীতে পড়ে সাগরে ভেসে যায়। এতে সে খুব কষ্ট পায় এবং লেজ দ্বারা সমুদ্র সেচন করে বাচ্চা দুটি উদ্ধার করার সংকল্প করে। অতপর সে লেজ দ্বারা সাগরের পানি সেচন করতে থাকে। তার এ কঠোর পরিশ্রম দেখে দেবরাজ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কাঠবিড়ালী তুমি কী করছ? কাঠবিড়ালী বলল, আমার বাচ্চা দুটি সাগরে তলিয়ে গেছে। তাদের উদ্ধারের জন্য জল সেচন করছি। ব্রাহ্মণ পুনরায় বলল, লেজ দ্বারা কি পানি সেচন করা সম্ভব? উত্তরে কাঠবিড়ালী বলল, চেষ্টা করলে সব কিছু করা যায়। অতঃপর সে প্রাণপণে লেজ দ্বারা সাগরের পানি সেচন করতে লাগল। কাঠবিড়ালীরা উদম ও চেষ্টা দেখে ব্রাহ্মণরূপী দেবরাজ, সমুদ্র হতে তার বাচ্চা দুটি উদ্ধার করে নিয়ে বললেন, ‘কাঠবিড়ালী! তোমার সদিচ্ছার জয় হোক।’ বোধিসত্ত্বগণকে বীর্য পারমী সাধনা করতে হয়।

**ক্ষান্তি পারমী :** ক্ষান্তি পারমী হচ্ছে সহনশীলতার সাধনা। ক্ষান্তি শব্দের অর্থ হলো : ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, নিবৃত্তি, বিরতি ইত্যাদি। ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ। জ্ঞানীগণ সর্বদা ক্ষান্তি ও সহিষ্ণুতার প্রশংসা করে থাকেন। শাস্ত্রে ক্ষান্তি ও তিতিকাকে পরম তপস্যা বলা হয়েছে। সর্ব অবস্থায় ক্ষমা বা সহনশীলতা প্রদর্শনের ব্রতই হচ্ছে ক্ষান্তি পারমী। বুদ্ধবৎসে গ্রন্থে বলা হয়েছে : ‘পৃথিবীতে শ্রুতি শুদ্ধি নানাবিধ ঋতু নিকম্বিত হলেও পৃথিবী নীরবে সহ্য করে, নিকেপকারীর প্রতি দয়া বা ক্রোধ কিছুই প্রদর্শন করে না। সেবুণ সকল মান-অপমান সহ্য করে ক্ষান্তি পারমী পূর্ণ করে সযোয্য লাভ করতে হয়।’ সবল হয়েও যিনি দুর্বলকে ক্ষমা করেন তাঁর ক্ষান্তিই পরম ক্ষান্তি। ক্ষান্তি পারমী চর্চাকারী ব্যক্তি লাভ-অলাভ, স্ব-অস্ব, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ এই আট প্রকার লোক ধর্মে অবিশ্বাস থাকেন। তাঁরা পৃথিবীর নয়্য মৌন, ইন্দ্রবীলের নয়্য স্থির এবং ঋতু স্রোতের নয়্য নির্মল হন। ক্রোধ আগুনের মতো দাঁড় দাঁড় করে জ্বলে ওঠে। ক্রোধ শত্রু নিজেকে দল্ল করে না, অপরকেও দল্ল করে। ক্রোধকে

একমাত্র কান্তি পারমীর অনুশীলন দ্বারা দমন করা যায়। বোধিসত্ত্বগণ সর্বদা কান্তি পারমী অনুশীলন করে সাধনার পথে নিজেদের এগিয়ে নেন।

**সত্য পারমী :** সর্বদা সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকার ব্রতকে সত্য পারমী বলে। বুদ্ধবংস গ্রন্থে বলা হয়েছে, ‘সম্মতম পারমী অর্থাৎ সত্য পারমী ব্রত দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে সত্যভাষি হলে সম্বোধি লাভের পথ সুগম হয়।’ সত্য পারমীতে কথা ও কাজের মধ্যে মিল থাকা প্রয়োজন। জাতকের বোধিসত্ত্ব অবস্থান পৌত্তম বুদ্ধের সত্য পারমী পূরণের অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। এসব কাহিনীতে তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে মিল বুঝে পাওয়া যায়। যেমন, মহাসুভসোম জাতকে দেখা যায়, বোধিসত্ত্ব নরমাংস খাদকের নিকট সত্য ক্রিয়া করে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি মতো তিনি পরদিন জীবন বিসর্জনের জন্য নরমাংস খাদকের নিকট উপস্থিত হন। নরমাংস খাদক তার সত্যব্রত দেখে বিস্মিত হন এবং বোধিসত্ত্বের নিকট জীবনের মূল্যবান উপদেশ লাভ করে তার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সে বলির উদ্দেশ্যে আনা সকল পশুকে মুক্ত করে দেয় এবং নরমাংস গ্রহণ হতে বিরত থাকার শপথ নেয়। এ জাতকে বোধিসত্ত্বকে বলতে দেখি, ‘নরমাংস খাদক আমাকে বধ করবে কিনা আমার কোনো সংশয় উৎপন্ন হয় নি। সত্য বাক্য রক্ষার জন্য আমি জীবনের মাত্রা ত্যাগ করে নরমাংস খাদকের নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম। সত্যে আমার সমকক্ষ কেই নেই। এরূপ ছিল আমার সত্য পারমী।’ ত্রিপিটকে সত্য পারমী চর্চার এরূপ আরও অনেক কাহিনী পাওয়া যায়।

**অধিষ্ঠান পারমী :** অধিষ্ঠান হলো দৃঢ় সংকল্পে অটল ও অচল থাকা। সর্ববিধ অন্তরাগ্রে পরাভূত করে কুশল কর্ম সম্পাদনে অবিচল থাকার ব্রতকে অধিষ্ঠান পারমী বলে। অধিষ্ঠান পারমীকে পারমীসমূহের মূলমন্ত্র বলা হয়। কারণ অধিষ্ঠান ছাড়া অতিকষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো যায় না। মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণের প্রাধান্য অবলম্বন হলো অধিষ্ঠান। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, কলাকলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সফলতার জন্য অধিষ্ঠান পারমীর অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন। বুদ্ধবংস গ্রন্থে বলা হয়েছে : অধিষ্ঠান পারমী গ্রহণ করলে সম্বোধি অর্জিত হয়। অতল, সুপ্রতিষ্ঠিত শিলাময় পর্বত যেমন কড়-ঝগায়ে কম্পিত হয় না, স্ত্রী স্থানে স্থিত থাকে, তদুপ তুমিও অধিষ্ঠানে সর্বদা নিশ্চল হও। এরূপ অটল চিত্তের অধিকারী ব্যক্তি সম্বোধি লাভে সক্ষম হন। ত্রিপিটকে বোধিসত্ত্ব জীবনে পৌত্তম বুদ্ধের অধিষ্ঠান পারমী পূরণের অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। চরিত্রপিটকে তেমিয় পণ্ডিত বোধিসত্ত্ব বলেন, ‘মাতা-পিতা আমার অগ্রিয় ছিল না। আমার নিজের সত্তা আমার কাছে অগ্রিয় নয়। কিন্তু সর্বজ্ঞতা জ্ঞান অর্জনই আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয়তর। এজন্য আমি বিভিন্নভাবে অধিষ্ঠান রক্ষা করেছি, কখনো অধিষ্ঠান ভঙ্গা করিনি।’

**মৈত্রী পারমী :** দ্রোহ, মারাত্মক, কষ্ট, প্রীতিভাব, ভালোবাসা ও উদারতা প্রদর্শন করাই হলো মৈত্রী। সর্ব প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করার ব্রতই হচ্ছে মৈত্রী পারমী। মৈত্রী পারমীই চরিত্র পরিপূর্ণভাবে মুন্যবৃত্তের বিকাশ সাধিত হয়। মানব জীবনে সফলতা বা পরিপূর্ণতা আনয়ন করতে মৈত্রী পারমীর গুরুত্ব অপরিণীম। বুদ্ধবংস গ্রন্থে মৈত্রী পারমী সম্পর্কে এরূপ বর্ণিত আছে : জল যেমন সং-অসং, হীন-উত্তম, সকলকেই শীতলতার দ্বারা শান্ত করে এবং শরীরের ময়লা বিমূর্ত্তিত করে, তেমনি শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি সমান প্রীতিভাব পোষণ করে মৈত্রী পারমীর সাধনা পূর্ণ করতে হয়। যারা মৈত্রী সাধনা করেন তাঁদের হিংসা, ক্রোধ ইত্যাদি দূর হয়। তাঁদের কায়-মন-বাক্য সংযত হয়। তাঁরা সর্বপ্রাণীর মঙ্গল কামনা করেন এবং সকলের প্রিয় হন। তাই মৈত্রী ভাবনাকারীর কোনো শত্রু থাকে না। তাঁদের ইহকাল ও পরকাল সুখের হয়। যিনি সকল জীবের প্রতি

মৈত্রীভাব পোষণ করেন, তিনি পরম শান্তি নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হন। এ কারণে বৃন্দ সবারকে মৈত্রী পারমী অনুশীলনের উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'মা যেমন একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করেন, তেমনি সবার প্রাণীর প্রতি অপরিমিত মৈত্রীভাব পোষণ করবে।' ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি আনয়নে মৈত্রী পারমীর অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন।

**উপেক্ষা পারমী :** উপেক্ষা হলো সর্ববিষয়ে চিত্তের নিরপেক্ষ ও সাম্য অবস্থা। সাধারণত প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তি দেখলে চিত্ত প্রকৃত হয়, অপ্রিয় বস্তু বা ব্যক্তি দেখলে চিত্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়। অনুবৃত্তভাবে প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিতে চিত্ত আনন্দিত ও দুঃখিত হয়। যথাযথ নিরীক্ষণের মাধ্যমে সর্ব বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে চিত্তের নিরপেক্ষ ভাব বজায় রাখার ব্রত হলো উপেক্ষা পারমী। উপেক্ষা পারমীর অনুশীলনে চিত্ত আসক্তিহীন বা বিরক্তিহীন, অনুকূল্যতা বা প্রতিকূল্যতা বিহীন থাকে। বৃন্দবংশ গ্রন্থে বর্ণিত আছে : তুলানদের ন্যায় মহাশয়ভাব সম্পন্ন হয়ে দৃঢ়চিত্তে উপেক্ষা পারমী অনুশীলন করতে হয়। সীতাম বৃন্দ বোমিসত্ত্ব অবস্থায় অনেকভাবে উপেক্ষা পারমী পূর্ণ করেছিলেন। মহাশোমহাসক জাতকে দেখা যায়, বোমিসত্ত্ব একজনে ব্রহ্মচারী পালনে ইচ্ছুক হয়ে শূন্যে অশ্রয় গ্রহণ করেন। এসময় তাঁর নাম হয় মহাশোমহাসক ঋষি। সংসার অসার, এই মেহ ও জীবন ক্ষণস্থায়ী – এগুণ অনিত্য চিন্তায় মগ্ন হয়ে তিনি সাংসারিক কাজকর্মে নিরীকৃত থাকতেন। এতে বহু লোক তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রশ্ন ছিলেন। ক্রমে শোমহাসক ঋষির লাভ-সংকার, যশ-খ্যাতি ও প্রশংসা আরও বেড়ে যায়। অপরদিকে কেউ কেউ তাঁকে ভগ্ন ঋষি বলে তিরস্কার করত। তিনি বলতেন, যে আমাকে দুঃখ দেয় কিংবা সুখ দেয় আমি উভয়ের প্রতি সমভাবাপন্ন। এমনকি আমার প্রতি যার দয়া নেই তার প্রতিও আমার সমভাব রয়েছে। যারা আমাকে প্রশংসা বা নিন্দা করে তাঁদের সবার প্রতি সর্বদা আমি সমভাবাপন্ন থাকি। এ আমার উপেক্ষা পারমী।

#### অনুশীলনমূলক কাজ

দান উপপারমী কাকে বলে?

নৈজম্মা শব্দের অর্থ কী?

আট প্রকার লোকধর্ম কী কী?

পাঠ : ৩

### পারমী সম্পর্কিত কাহিনী : মহাকপি জাতক

মহাকপি জাতকটি পাঠ করে আমরা দশ পারমী বোঝার চেষ্টা করব।

'কপি' শব্দের অর্থ বানর। একবার বোমিসত্ত্ব বানররূপে জন্মগ্রহণ করে মহৎ কাজের জন্য প্রশংসিত হয়েছিলেন। এজন্যে এ জাতকটি মহাকপি জাতক নামে অভিহিত। বোমিসত্ত্ব মহাকপি এক বনে বাস করত। বনের পাশেই ছিল কাশী গ্রাম। ঐ গ্রামের এক কৃষক বনের মধ্যে তার গরু বৃজতে এসে পথ হারিয়ে ফেলে। পথ বৃজতে বৃজতে সে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে পড়ে। একটি ফলবান বৃক্ষ দেখে সে ঐ বৃক্ষে উঠে ফল খেতে গিয়ে বৃক্ষের নিচে গর্তে পড়ে যায়। গর্তটি খুব গভীর ছিল। কৃষক নিজের চেষ্টায় গর্ত থেকে উঠে আসতে

পারছিল না। এভাবে দশদিন অতিবাহিত হলো। কৃষক আরও দুর্বল হয়ে গেল। এক সময় বানরবুড়ী বেহিসত্ৰ ফল খাওয়ার জন্য ঐ বৃক্ষের কাছে এসে মৃতপ্রায় কৃষককে গর্তের মধ্যে দেখতে গেল। কৃষককে বিপদগ্রস্ত দেখে বানরের দয়া হলো। সে কৃষককে বাঁচানোর সংকল্প করল এবং বাঁচানোর উপায় খুঁজতে লাগল। নিজের জীবন বিপন্ন করে হলেও সে কৃষককে বাঁচানোর শপথ করল। অনেক চিন্তা করে সে বাঁচানোর উপায় বের করল। যদি কৃষককে পিঠে নিয়ে এক লাফে গর্ত থেকে উঠে আসা যায় তবে তাকে বাঁচানো সম্ভব। এই ভেবে সে পিঠে বড় পাথর বেঁধে বার বার লাফ দেওয়া অনুশীলন করতে থাকল। এইকাজে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস অর্জনের পর সে উদ্ধার অভিযান শুরু করলে। তার জীবন বিপন্ন হতে পারে জেনেও সে তার সংকল্পে অটল রইল। বারবার চেষ্টার পর অবশেষে সে কৃষককে উদ্ধার করতে সক্ষম হলো।

কৃষককে গর্ত থেকে উদ্ধারের পরে বানর অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তাই অচেতন কৃষকের কোলে মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে যায়। এসময় কৃষকের জ্ঞান ফিরলে সে বানরকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। পাথর দিয়ে সে বানরের মাথায় আঘাত করে। এতে বানরের মাথা ফেটে রক্ত বের হতে থাকে। তখন বানরটি এক লাফে পাছে উঠে যায়। এরপর বানর চিন্তা করল কীভাবে কৃষককে বন থেকে বার হতে সাহায্য করা যায়। বানর এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে যেতে থাকে এবং রক্তের ফোঁটা নিচে পড়তে থাকে। এভাবে রক্তের ফোঁটা অনুসরণ করে কৃষক জঙ্গল থেকে বের হতে সক্ষম হয়।

ঐ কৃষককে বাঁচানোর জন্য বানরের কোনো স্বার্থ ছিল না। শুধু দয়া ও করুণার বশবর্তী হয়ে মহাকপি কৃষকের জীবন রক্ষা করেছিল। বেহিসত্ৰগুণ এবুপ আত্মত্যাগ করে পরের হিতের জন্য কুশলকর্ম করেন। এভাবেই পারমীসমূহ পূর্ণ করতে হয়।

এখন উপরে বর্ণিত মহাকপি জাতকে বানরবুড়ী বেহিসত্ৰ কীভাবে কোন পারমী পূর্ণ করেছেন তা চিহ্নিত করব।

- ১) (বানরবুড়ী) বেহিসত্ৰ নিজের জীবন বিপন্ন করে কৃষককে বাঁচাতে চেয়েছেন। আত্মত্যাগের এই ইচ্ছাই দান পারমীর অন্তর্গত।
- ২) কৃষক পাথর দিয়ে বানরের মাথায় আঘাত করা সত্ত্বেও তিনি কোনো হিংসা বা প্রতিহিংসা প্রকাশ করেননি। এটি শীল পারমী।
- ৩) কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে তিনি কৃষকের জীবন রক্ষায় নিয়োজিত হননি। এটি নৈশ্চল্য পারমী।
- ৪) কৃষককে গর্ত থেকে বাঁচানোর জন্য বেহিসত্ৰ যে উপায় উদ্ভাবন করেন তা প্রজ্ঞা পারমী।
- ৫) কৃষককে উদ্ধারের জন্য বার বার লাফ দেওয়া অনুশীলন করে তিনি সাহসের সাথে কাজটি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বীর্য পারমীর উদাহরণ প্রদর্শন করেন।
- ৬) মাথায় আঘাত পেয়ে রক্তক্ষরণ ও প্রচণ্ড কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও কৃষকের প্রতি ক্ষুণ্ণ আচরণ না করে চরম সহনশীলতা ও উদারতা প্রকাশ করেন। এই অহিংস চৈতন্যই ক্ষান্তি পারমী।
- ৭) সংকল্প রক্ষায় তিনি ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নিজের জীবন বিপন্ন অবস্থায়ও তিনি সংকল্পে অনড় ছিলেন। এটি সত্য পারমী।
- ৮) কৃষক বানরকে হত্যা করার চেষ্টা করলেও তিনি কৃষকের জীবন রক্ষার লক্ষ্য থেকে চ্যুত হননি। এই লক্ষ্যে একাত্মতাই অধিষ্ঠান পারমী।

- ৯) গভীর গর্তে পতিত মরণাপন্ন কৃষককে দেবে বানর যে করুণা ও উষ্ণিয়ার প্রকাশ করেন তা মৈত্রী পারমী।
- ১০) বানর কৃষকের হাতা প্রচেষ্টাকে পুরস্কৃত না দিয়ে ঐর্ষ্য ও করণীয় কর্মে একাত্মতা বজায় রেখে যান এবং কৃষককে বনের বাইরে যেতে সাহায্য করেন। এই মনোভাব দ্বারা তিনি উপেক্ষা পারমীর দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

বৌদ্ধ সাহিত্যে বোধিসত্ত্বের পারমী পূরণের একুশ আরও অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। কাহিনীগুলো পাঠ করলে পারমী পূরণের উৎসাহ জাগ্রত হয়।

#### অনুশীলনমূলক কাজ

বানররূপী বোধিসত্ত্ব কীভাবে দান পারমী পূর্ণ করেছিলেন?  
মহাকপি জাতকে বোধিসত্ত্ব কী কী পারমী পূর্ণ করেছিলেন?

#### পাঠ : ৪

### বৌদ্ধধর্মে দশ পারমী চর্চার গুরুত্ব

নির্বাণ বৌদ্ধদের পরম লক্ষ্য। পারমীর চর্চা ব্যতীত নির্বাণ লাভ সম্ভব নয়। তাই বৌদ্ধধর্মে পারমী গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হিসেবে স্বীকৃত এবং বৌদ্ধদের জন্য পারমী অনুশীলন করা অপরিহার্য। দশপারমী পূরণের মাধ্যমে সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ লাভ করেন। বোধিসত্ত্বগণও বুদ্ধত্ব লাভের জন্য পারমী চর্চা করেন। কুশল কর্ম করার মাধ্যমে পারমী চর্চা করতে হয়। দশ পারমী চর্চায় চরিত্রের উৎকর্ষতা ও পরিশুদ্ধতা অর্জিত হয়। মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধিত হয়। ভয়-ভীতি, লোভ-দ্বেষ-মোহ, অজ্ঞতা, শত্রুতা প্রভৃতি দূরীভূত হয়। আত্মসিদ্ধির সেবা এবং পরোপকার করার হ্রেরণা জাগায়। দয়িত্ববোধ, সহর্মমিতা, সহিষ্ণুতা, কর্মোদ্যম প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। পারমীর অনুশীলনে ছাত্র জীবনেও সাফল্য লাভ করা যায়। তাই ছাত্র জীবনে পারমীর অনুশীলন করা একান্ত দরকার। পরিবার ও সমাজে বিরাজমান বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা দূর করে শান্তি স্থাপনে পারমী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পারমীর গুণসমূহ শূন্য বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের জন্য নয় বরং সকল বিবেক বৃদ্ধি সম্পন্ন মানুষের আচরণীয় হতে পারে। দশপারমীর চর্চা জীবনে সাফল্য ও পূর্ণতা আনয়ন করে। পরিশেষে বলা যায়, মৈত্রিক, মানবিক ও উন্নত জীবন গঠনে দশপারমী চর্চা অত্যাৱশ্যক।

#### অনুশীলনমূলক কাজ

ছাত্র হিসাবে তুমি কোন কোন পারমী অনুশীলন  
করতে পার উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। দান পারমী কয় প্রকার ?

- |        |         |
|--------|---------|
| ক) দুই | খ) তিন  |
| গ) চার | ঘ) পাঁচ |

২। বৌদ্ধধর্মে পারমীর গুরুত্ব অপরিমীম, কারণ এতে –

- জীবনের উৎকর্ষতা সাধিত হয়
- নির্বান লাভের হেতু উৎপন্ন হয়
- বুদ্ধত্ব লাভের হেতু উৎপন্ন হয়।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

উচিত্যে রাখাইন পদুমুত্তর বৃক্ষের সময় নানাবিধ কুশল কর্ম সম্পাদন করে ইহজন্মে উচ্চ বংশে জন্মলাভ করেন। তিনি জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে প্রব্রজ্যধারী হয়ে ধ্যান-সামনায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। এতে পরজন্মে তাঁর বোধিজ্ঞান অর্জন হবে বলে ধারণা জন্মে।

৩। উচিত্যে রাখাইন কী পূরণের লক্ষ্যে প্রব্রজ্যা লাভ করেন ?

- |          |           |
|----------|-----------|
| ক. সুখ   | খ. স্বর্ণ |
| গ. পারমী | ঘ. জ্ঞান  |

৪। পরজন্মে বোধিজ্ঞান অর্জিত হবে উচিত্যে রাখাইনের এই ধারণার প্রকাশ পেয়েছে –

- পারমী পূরণের সংকল্প
- কুশল কর্ম সম্পাদন
- কঠোর তপস্যা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

**সৃজনশীল প্রশ্ন :**

১। কুনেন্দু তম্বজ্যো নিজ বাড়িতে এক অর্হৎ ভিক্ষুকে মঞ্জলসূত্র শ্রবণের উদ্দেশ্যে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু বাড়ির অনতিদূরে ঝালের খ্রিজের একাংশ বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়। যার কারণে ঐ ভিক্ষুর আগমন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কিন্তু কুনেন্দু তম্বজ্যো সুকৌশলে ভিক্ষুকে ঐদিন পারাপারের ব্যবস্থা করে বাড়িতে আনেন। ভবিষ্যতে তিনি যাতে ভিক্ষু হতে পারেন এজন্য অর্হৎ ভিক্ষুর নিকট প্রার্থনা করেন।

ক. বুন্দলাতে অভিলাষী রেখিসত্ত্বগণকে কী পূর্ণ করতে হয় ?

খ. মৈত্রী পারমী বলতে কী বোঝায় ?

গ. কুনেন্দু তম্বজ্যোর কর্মকাণ্ডের সাথে পারমী পার্টের কোন ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত কর্মকাণ্ডের দ্বারা কুনেন্দু তম্বজ্যো যে পারমী পূরণে সমর্থ হবেন – তা যুক্তি সহকারে বুঝিয়ে দেখ।

২। মুনিপ্ত চাকমা ও যতীপ্ত চাকমা দুজনেই সহপাঠী ছিলেন। যতীপ্ত চাকমা অভ্যস্ত কুটিল প্রকৃতির ছিল। বিধায় মুনিপ্তের সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল না। একদা মুনিপ্ত চাকমার সুবাদে নিজ কর্মস্থলে যাওয়ার সময় রাস্তায় ডাকাত দলের আক্রমণে নির্ধাতনের স্বীকার হয়ে বন্দি অবস্থায় দিনযাপন করতে থাকেন। যতীপ্ত চাকমাও একদিন অনুরূপ ঘটনায় পতিত হন। ডাকাতেরা দুইজনকে একত্রে বন্দি করে রাখে। মুনিপ্তের আহতের অবস্থা দেখে যতীপ্ত অবাক হন। অতঃপর দুজনে মিলে কৌশলে পালিয়ে গিয়ে নিরপদ স্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হন। তারা ডাকাতদের প্রতি প্রতিহিংসা না করে ক্ষমা করে দেন।

ক. খেরবাদ বৌদ্ধমতে, পারমী কয় প্রকার ?

খ. সত্য পারমী বলতে কী বোঝায় ?

গ. মুনিপ্ত ও যতীপ্ত চাকমার ঘটনায় রেখিসত্ত্বের পারমী পূরণে যে বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয়েছে—ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত বিষয়গুলো উভয়ের আচরণিক পরিবর্তনে দশপারমীর পূরক মূল্যায়ন কর।



**স্থানস্থান পূরণ কর :**

১. 'পারমী' শব্দের অর্থ.....।
২. গৌতমবুদ্ধ এক জনে .....নগরে জন্মগ্রহণ করেন।
৩. বোধিসত্ত্ব জন্মজন্মান্তরে ..... সমূহ পূর্ণ করেন।
৪. পারমীসমূহ প্রত্যেকটি ..... প্রকার
৫. আমরা .....করার প্রত্যয় নিয়ে পারমী চর্চা করতে পারি।

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. পারমী বলতে কী বোঝা ব্যাখ্যা কর?
২. সুমেরু তপস কী করেছিলেন?

**রচনামূলক প্রশ্ন :**

১. দান পারমী বর্ণনা কর।
২. 'মহাবলি' জাতকের কাহিনী বর্ণনা কর।

## সন্তম অধ্যায়

### ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব

প্রত্যেক ধর্মেই কিছু আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব থাকে। বৌদ্ধধর্মেও আছে। আমরা পূর্ববর্তী শ্রেণিতে বৌদ্ধধর্মীয় কিছু আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব সম্পর্কে জেনেছি। এসব আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি সমাজ এবং সংস্কৃতি সম্পর্কেও অনেক কিছু শেখা যায়। প্রত্যেকটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের স্বতন্ত্র শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এসব জানার জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণ করা উচিত। এছাড়া ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে কঠিন ধর্মীয় তত্ত্ব বুঝতে সহজ হয়। ধর্মীয় কঠোর নিয়ম-নীতি মেনে চলতে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। পরাম্পরিক সুসম্পর্ক ও সৌজাত্যবোধ সৃষ্টি হয়। তাই এসব আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এ অধ্যায়ে আমরা কতিপয় বৌদ্ধধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব সম্পর্কে পড়ব।

#### এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- \* ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- \* প্রব্রজ্যা ও উপসম্মল্লা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- \* শ্রামণ্য জীবনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- \* সুফলসহ সংঘদান ও অষ্ট পরিষ্কার দান বর্ণনা করতে পারব।

#### পাঠ : ১

### ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের গুরুত্ব

আচার-অনুষ্ঠান ধর্মের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সৌতমবৃন্দ তাঁর ধর্ম প্রচারের প্রথম দিকে আচার-অনুষ্ঠানের কোনো বিধি প্রবর্তন করেন নি। তিনি বলেছিলেন অন্তরের মধ্যে আলোক উৎপাদনই হলো ধর্মের মূল লক্ষ্য। এই আলোক হলো জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। এই আলো প্রজ্ঞার সাধনা অর্থাৎ কঠিন। শান্ত ও স্থির চিত্তে গভীর একপ্রান্তার মাধ্যমে এ সাধনা করতে হয়। কিন্তু আমাদের মন বা চিত্ত বড়ই চঞ্চল। এটিকে বেশে আনার জন্য কোনো একটি অবলম্বন দরকার। এখানে অবলম্বন হলো চিত্তাশীল কোনো কাজ, যার মাধ্যমে মন বা চিত্তকে স্থির রাখা যায়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবসমূহ মনকে স্থির রাখার অবলম্বন হিসেবে সূক্ষ্ম পালন করে। ধর্ম ও নৈতিকতার পথে পরিচালিত করে। এজন্য তথাগত বুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান উদ্ভাবনের উপদেশ প্রদান করেন।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য চিত্তের বিকাশ সন্ধান ও পুণ্য অর্জন। এগুলোর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বও রয়েছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে সকলে এক স্থানে মিলিত হয়। এতে পরস্পরের ভাব বিনিময় হয়। সামাজিক সম্প্রীতি সুদৃঢ় হয়।

গৌতমবুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ সূত্রে সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণের উপদেশ দিয়েছেন। এতে তিনি সাতটি অনুশীলনীয় নীতির কথা বলেছেন, যা 'সম্মত অপরিহার্যীয় ধর্ম' নামে পরিচিত। এ নীতিগুলো পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রে ঐক্য, সম্মতি ও সমৃদ্ধি আনয়নে সহায়ক। এ প্রসঙ্গে দুটি নীতি উল্লেখ করা হলো : ১। সভা সমিতির মাধ্যমে যারা সব সময় একত্র হয় তাদের শ্রীবৃদ্ধি হয়; ২। যারা একতাবান্ধবভাবে সভা-সমিতিতে সম্মিলিত হয়, সভা শেষ হলে এক সত্তো চলে যায় এবং কোনো কিছু করার কারণ ঘটলে সম্মিলিতভাবে করে, তাদের উন্নতি ছাড়া অবশিষ্ট হয় না। সূত্রগ্রন্থ সমাজের সকলের সাথে মাঝে মাঝে মিলিত হওয়া, যত বিনিময় করা অস্তাবশ্যক। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও উৎসবসমূহ সম্মিলিত হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। সন্তানদান, অষ্টপরিষ্কার দান, প্রভৃতি, উপসম্পদা শুভুতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের নানা শ্রেণির মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত ও তার বিনিময় হয়। অনুষ্ঠানগুলো সম্মিলিতভাবে উদ্‌যাপন করার মধ্যেও আনন্দ আছে।



পুণ্যেপূর্ণা দিয়ে বিহারে যাচ্ছেন

এছাড়া পুণ্য অর্জনের ক্ষেত্রেও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যেমন খেব গাথার রাষ্ট্রপাল সর্ষবিরের জীবনীতে দেখা যায় - তিনি গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী যুগের বুদ্ধের সময় একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি রাজবর্মচারীর পদ গ্রহণ করেন। একদিন রাজপুত্রের বৃদ্ধ ও তার শিষ্যদের দান দিতে দেখে তিনিও শ্রদ্ধা চিন্তে দানকার্যে সহায়তা করেন। এ সময় তিনি অবিশ্যত জীবনে বৃদ্ধ শিষ্য হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। দানকার্যে শ্রদ্ধা চিন্তে সহায়তার কারণে তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় জন্মগ্রহণ করে বুদ্ধের শিষ্য হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অসীম পুণ্য অর্জিত হয়েছে এবুল অসংখ্য কাহিনী বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায়। সূত্রগ্রন্থ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিণীম। তাই আমাদের সকল প্রকার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা উচিত।

#### অনুশীলনমূলক কাজ

বৌদ্ধধর্মের কয়েকটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের নাম বল

## পাঠ : ২

## প্রজ্যা

পারিবারিক জীবন ভাগ করে বৌশ্ব রীতিতে সন্ধ্যা অবলম্বনের নাম প্রজ্যা। প্রজ্যা বৌশ্ব সন্ধ্যা জীবনের প্রথম পর্যায়। এটিকে শ্রমণ হওয়া বা শ্রামণধর্মে দীক্ষিত হওয়াও বলে। এটি বৌশ্বদের পুণ্যময় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান; সংসার ভ্যাগের মাধ্যমে মুক্তির পথ অনুসন্ধানের প্রথম পদক্ষেপ। বৌশ্ব মাত্রই জীবনে একবার হলেও প্রজ্যা গ্রহণ করে থাকে। পরম শান্তিময় নির্বিশেষ উপনীত হওয়াই প্রজ্যা গ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রজ্যার অর্থ হলো সকল শ্রকার পাপকর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখার অঙ্গীকার। পানি ভাষায় বলা হয় – পাপকান্দং মগ্ধং পকাজাতীতি পকজিতো। অর্থাৎ নিজের পাপমগ্ন বর্জনে সংকল্পবশ্ত হন বলেই তাকে প্রজ্যিত বলা হয়।

প্রজ্যা গ্রহণ গৃহীদের সর্বোচ্চ মঙ্গল কাজ। বৃশ্চের মতে, গর্ভে পতিত হলে মানুষের মুক্তি যেমন কষ্টকর, সেবুপ সংসারে আবশ্ব হলে সেখান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াও দুশ্কার। মানুষ সহজে লোভ-দ্বेष-মোহ থেকে মুক্ত হতে পারে না। সেজন্য বৃশ্ব সংসারকে কারাগার এবং প্রজ্যাকে উন্মুক্ত আকাশের সাথে তুলনা করেছেন। তাই অনেকে ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন এবং ভোগ-ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে নির্বিশেষে সম্মানে প্রজ্যা গ্রহণ করেন। সেজন্য সন্তানদের প্রজ্যা দেওয়া প্রত্যেক মাতাপিতার কর্তব্য। প্রজ্যা প্রদানের মাধ্যমে মাতাপিতা সন্তানকে ধর্মীয় নীতি-আদর্শ শেখার এবং বিশুদ্ধ জীবন যাপন করার সুযোগ করে দেন।

## প্রজ্যা গ্রহণের লিয়ম

প্রজ্যা প্রার্থীকে প্রথমে মাতা-পিতার অনুমতি নিতে হয়। প্রজ্যা গ্রহণের দিন মধ্য ক মুগুন করতে হয়। তারপর ভিক্ষু শ্রমণদের ব্যবহার্য অষ্টপরিষ্কার নিয়ে বিহারে উপস্থিত হতে হয়। অষ্টপরিষ্কার বা এটিটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য হলো : ১। সন্ধ্যাটি, যাকে দোষাজিকও বলা হয়। এ চীবরটি ভাঁজ করে কাঁধে রাখা হয়; ২। উত্তরাসঙ্গ, যাকে একাজিক বা বর্হিবাসও বলা হয়। এ চীবরটি ঘারা শরীরের উর্ধ্বাংশ আবৃত করা হয়; ৩। অত্তর্বাস - এ চীবর শরীরের নিম্নাংশ আবৃত করার জন্য পরিধান করা হয়; ৪। ভিক্ষাপাত্র; ৫। কুর; ৬। সূঁ-সূতা; ৭। কটিবন্ধনী (কোমরবন্ধনী) এবং ৮। জলটুকনি। এগুলোসহ বিহারথাকের কাছে প্রজ্যা প্রার্থনা করতে হয়। অষ্টপরিষ্কারসমূহ সুন্দর করে সাজিয়ে নিতে হয়। চীবর তিনটি ক্রমায়ে গোলাকার করে মুড়িয়ে মন্দিরের চূড়ার মতো করে সাজাতে হয়। চীবরের মুড়টি কটিবন্ধনী দিয়ে বাঁধতে হয়। তারপর ভিক্ষাপাত্র রাখা হয়। অন্যান্য দ্রব্যগুলোও ভিক্ষাপাত্রে রাখা হয়।



চীবরসহ ভিক্ষাপাত্র

সাত বছরের কম বয়সের ছেলেকে প্রব্রজ্যা সেওয়ার বিধান নেই। কারণ এ বয়সে মানুষের উপলব্ধিবোধ পরিপক্ব হয় না। আবার যে ভিক্ষু কমপক্ষে দশ বছর ভিক্ষুজীবন পূর্ণ করেননি তিনি প্রব্রজ্যা প্রদান করতে পারেন না। সুতরাং প্রব্রজ্যা প্রার্থিকে আগেই আচার্য ত্রিক করে নিতে হয়। আচার্যকে গুরুও বলা হয়। প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভিক্ষুদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তাঁর পরামর্শে অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। তাঁকে বলা হয় উপাধ্যায়। উপাধ্যায় প্রব্রজ্যিতকে নতুন নাম প্রদান করেন। প্রব্রজ্যিত ব্যক্তি প্রব্রজ্যার পর হতে নতুন নামেই পরিচিত হন।

প্রব্রজ্যাপ্রার্থীকে প্রথমে ত্রিশরত্নসহ পঞ্চশীল গ্রহণ করতে হয়। শূন্যভাবে এবং স্মৃতিরূপে ত্রিশরত্ন উচ্চারণ করতে হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত গৃহীরাও সমবেতভাবে পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, প্রব্রজ্যা দাতা এবং প্রব্রজ্যাপ্রার্থী উভয়ের উচ্চারণ স্পষ্ট ও শূন্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। পঞ্চশীল গ্রহণ করার পর প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ভিক্ষুদের কাছে প্রব্রজ্যা শীল প্রার্থনা করেন। প্রব্রজ্যাশীলকে দশশীলও বলা হয়।

### প্রজ্ঞা প্রার্থনা

প্রব্রজ্যা প্রার্থনার সময় প্রব্রজ্যা প্রার্থীকে বিশেষ নিয়মে বসতে হয়। গোলাকার তীবরের ছুড়টি দুই হাতে ধরে কপালে লাগাতে হয়। তারপর পায়ের আঙুলের ওপর ভর রেখে দুই হাঁটু জোড় করে বসতে হয়। নিম্নোক্ত প্রার্থনাটি অর্ধ উপলব্ধি করে বলতে হয় :

ওকাস অহং ভন্তে পক্কজং য্যামি।

দুত্তিবম্ভি অহং ভন্তে পক্কজং য্যামি।

তত্তিবম্ভি অহং ভন্তে পক্কজং য্যামি।

বাংলা অনুবাদ : ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন, আমি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয়বারও ভন্তে, আমি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করছি।

তৃতীয়বারও ভন্তে, আমি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করছি।

একপর প্রব্রজ্যা প্রার্থনার উদ্দেশ্য ও কারণ হিসেবে নিচের প্রার্থনাটি করতে হয়।

সকদুন্ধং নিসংসরণং নিকাবণং সচ্ছিক্করণঞ্চায় ইমং কাসাবং গহেত্বা পক্বাজেথং মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায়।

দুত্তিবম্ভি সকদুন্ধং নিসংসরণং নিকাবণং সচ্ছিক্করণঞ্চায় ইমং কাসাবং গহেত্বা পক্বাজেথং মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায়।

তত্তিবম্ভি সকদুন্ধং নিসংসরণং নিকাবণং সচ্ছিক্করণঞ্চায় ইমং কাসাবং গহেত্বা পক্বাজেথং মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায়।

বাংলা অনুবাদ : ভন্তে, সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তিক্রান্ত ও নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার জন্য অনুগ্রহ করে এই কাষায় বস্ত্র (চাবরসমূহ) গ্রহণ করে আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।

দ্বিতীয়বার ভক্তে, সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ ও নির্বাণ প্রত্যাক করার জন্য অনুগ্রহ করে এই কাষায় বস্ত্র (চীবরসমূহ) গ্রহণ করে আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।

তৃতীয়বার ভক্তে, সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ ও নির্বাণ প্রত্যাক করার জন্য অনুগ্রহ করে এই কাষায় বস্ত্র (চীবরসমূহ) গ্রহণ করে আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।

তারপর প্রব্রজ্যা প্রার্থীকে দীক্ষাদানকারী আচার্যের হাতে চীবরসমূহ তুলে দিতে হয়। অতঃপর হাতজোড় করে নিচের প্রার্থনাটি করতে হয় :

সবদুদ্ধ নিসূরণ নিকাবং সচ্ছিকরণধায় এতং কাসাবং দত্তা পবাজেথং মং ভক্তে, অনুকম্পং উপাদায়।

দুঃখিনিষি সবদুদ্ধ নিসূরণ নিকাবং সচ্ছিকরণধায় এতং কাসাবং দত্তা পবাজেথং মং ভক্তে, অনুকম্পং উপাদায়।

তত্তিনিষি সবদুদ্ধ নিসূরণ নিকাবং সচ্ছিকরণধায় এতং কাসাবং দত্তা পবাজেথং মং ভক্তে, অনুকম্পং উপাদায়।

**বাংলা অনুবাদ :** ভক্তে, সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ ও নির্বাণ প্রত্যাক করার জন্য অনুগ্রহ করে এই কাষায় বস্ত্র (চীবরসমূহ) দিয়ে আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।

দ্বিতীয়বার ভক্তে, সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ ও নির্বাণ প্রত্যাক করার জন্য অনুগ্রহ করে এই কাষায় বস্ত্র (চীবরসমূহ) দিয়ে আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।

তৃতীয়বার ভক্তে, সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ ও নির্বাণ প্রত্যাক করার জন্য অনুগ্রহ করে এই কাষায় বস্ত্র (চীবরসমূহ) দিয়ে আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।

অতঃপর, উপাধ্যায় শরীরের বত্রিশ প্রকার অশুভ বিষয় হতে প্রথম পাঁচটিকে নিয়ে কর্মস্থান ভাবনা দেন। এগুলো হলো – কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো। এটি অনুলোম প্রতিলোমাকারে উচ্চারণ করতে হয়। তারপর চীবর প্রত্যাবেশণ ভাবনার মাধ্যমে চীবর গ্রহণ করতে হয়। ভাবনাটি এরূপ :

পটিসজ্জা যোনিসো চীবরং পটিসেবামি, যাবদেব সীতসূস পটিমাতায় উপহাস্ পটিমাতায়, ডংস-মকস-বাতাতপ-সিরিসেপ সম্বসুসানং পটিমাতায়, যাবদেব হিরিকোপীনং পটিচ্ছসনধং।

**বাংলা অনুবাদ :** সজ্জানে মনোযোগ সহকারে স্মরণ করতে আমি এ চীবর পরিধান করছি। এ চীবর শূন্য শীত ও উষ্ণতা নিবারণ, নরশক-মশক-মুগালায়-রৌদ্র-সরীসৃপ ও বৃদ্ধিহাদের আক্রমণ ও দংশন নিবারণ এবং লজ্জা নিবারণের জন্যে।

এ ভাবনা গ্রহণের পর গৃহী পোশাক পরিত্যাগ করে চীবর পরিধান করা হয়। চীবর পরিধান করে ভিক্ষুসঙ্ঘের সামনে এসে প্রব্রজ্যা শীল বা দশশীল প্রার্থনা করতে হয়। এ সময় উপাধ্যায় বা আচার্য দশশীল প্রদান করেন। দশশীল গ্রহণের পর প্রব্রজ্যা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। দশশীল হলো প্রব্রজিতদের নিত্য পালনীয় দশটি নিয়ম। এরপর প্রব্রজিত শ্রমণকে নতুন নাম প্রদান করা হয়। প্রব্রজিত ব্যক্তি যতদিন দীক্ষিত অবস্থায় থাকেন ততদিন এ নামে পরিচিত হন।

প্রব্রজ্যা দান সম্পন্ন হলে উপস্থিত দায়ক-দায়িকাংশ প্রব্রজিতকে অভিবাদন জানিয়ে নানা সুব্য সামগ্রী দান করেন।

প্রব্রজ্যা কার্যক্রমের প্রত্যেকটি পর্যায় ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন করতে হয়, যাতে প্রব্রজ্যা প্রার্থীর কাছে প্রতিটি ধাপের পরিবর্তন সহজে বোধগম্য হয়। এভাবে প্রব্রজ্যা প্রার্থী তাঁর জীবনের পরিবর্তন যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হন।

### অনুশীলনমূলক কাজ

কত বছরের কম বয়সের ছেলেকে প্রব্রজ্যা প্রদান করা যায় না?

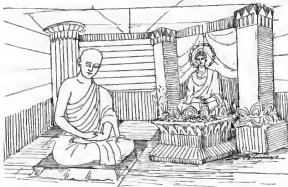
প্রত্যবেক্ষণ ভাবনাটির বাংলা অনুবাদ বল।

দশশীল কাদের নিত্যপালনীয় শীল?

পাঠ : ৩

### প্রজ্ঞার সূফল

প্রব্রজ্যা এক প্রকার বিশুদ্ধ জীবনচর্চা ব্রত। এটিকে মুক্ত জীবনও বলা যায়। এবূধ ব্রত গ্রহণের জন্য প্রথমে নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হয়। কারণ এ জীবন সাধারণ জীবনধারা থেকে ব্যতিক্রম। নির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে অতিবাহিত করতে হয় দৈনন্দিন জীবন। প্রব্রজিতদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এগুলো শারীরিক ও মানসিকভাবে পালন করতে হয়। তাঁদের নৈতিক জীবন যাপন ও সর্বদা কুশল কর্ম সম্পাদনে সচেষ্ট থাকতে হয়। সকল প্রকার পাপকর্ম হতে বিরত থাকতে হয়। নির্বাণ লাভের জন্য উদ্যমী হতে হয়। ফলে প্রব্রজিতের জীবন পঙ্কিলভাস্কৃত থাকেন। নৈতিক শক্তিকে বলিয়ান থাকেন। নির্মল আনন্দের অধিকারী হন। এসব গুণের জন্য সকলের প্রশংসা লাভ করেন। এছাড়াও প্রব্রজার অনেক সূফল রয়েছে।



খ্যানরত একজন তরুণ শ্রমণ

নিচে প্রব্রজ্যার কতিপয় সুফল বর্ণিত হলো :

- ১। কায়, বাক্য ও মনোদ্বার সংযত হয়।
- ২। রাগ, মেঘ, মোহ প্রশমিত হয়।
- ৩। অকুশল কর্মচেতনা বিনাশ হয়।
- ৪। কুশলকর্ম সম্পাদনে ত্রুটি হন।
- ৫। অন্ন লাভে সন্তুষ্ট থাকেন।
- ৬। জ্ঞান সাধনায় প্রত্যগী হন।
- ৭। ভিক্ষুজীবন গ্রহণে আগ্রহী হন।
- ৮। দুর্গতির পথ বন্ধ হয় এবং সুগতি প্রাপ্ত হন।
- ৯। বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্ব জানা ও চর্চার সুযোগ হয়।
- ১০। বিপুল পুণ্য সম্মুখীন অধিকারী হন।
- ১১। জীবন সুনিয়ন্ত্রিত এবং আশ্রিতমুক্ত হয়।
- ১২। নির্বাণ পথের অনুগামী হন।

এছাড়া প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের মাধ্যমে অন্যদেরও ধর্মীয় চেতনাবোধ জন্মিত হয়। প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক চেতনাও বিকশিত হয়। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পূর্বেই আনন্দ শোভাযাত্রা হয়। এসময় স্তম্ভিমূলক গান, বৃক্ষধীর্ঘন ও জয়ধ্বনি করা হয়। সকল বয়সের নারী-পুরুষ শ্রদ্ধাচিত্তে এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে প্রব্রজ্যা প্রার্থীকে অভিনন্দিত করা হয়। আবার যারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, প্রব্রজ্যা তারপরে পর তাঁদেরকে পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয়। এটি হলো কিছুদিন বিশুদ্ধ জীবনচারণ অনুশীলনের সম্মাননা বা কৃতজ্ঞতা। সুশৃঙ্খল জীবন গঠনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় প্রত্যেক বৌদ্ধের জীবনে কিছুদিন হলেও এই প্রব্রজ্যাপ্রত গ্রহণ করা উচিত। এই প্রত গ্রহণ ছাড়া প্রব্রজ্যা জীবনের বিশুদ্ধতা, আদর্শ ও উৎকর্ষতা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, সন্তানকে প্রব্রজ্যা দান ব্যতীত বৌদ্ধধর্মের উত্তরাধিকারী হওয়া যায় না। সপ্তটি অশোক বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তিনি চুরাশি হাজার ষাটচৈত্য ও চুরাশি হাজার বিহার মহা উৎসবের সঙ্গে দান করে ভিক্ষুসভাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন - 'মননীয় সম্রাট! বুদ্ধ শাসনে শ্রেষ্ঠ দাতা কে? তাঁর দান অধিক?' উত্তরে ভিক্ষুসভা বলেন, 'মহারাজ! আপনিই শ্রেষ্ঠ দাতা। আপনার মতো দান আর কেহ করেনি। আপনাব দান সর্বাপেক্ষা অধিক।' একথা শুনে সপ্তটি অশোক খুবই প্রীতি অনুভব করেন। আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল হয়ে তিনি পুনরায় ভিক্ষুসভাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ভগ্নে! আমি বুদ্ধশাসনের উত্তরাধিকারী হতে পেরেছি কি?' তখন ভিক্ষুসভার সম্মতি ক্রমে মোগলগীপ্তুর তিয়া স্তম্ভের বলেন, 'মহারাজ! আপনি ভিক্ষুসভার ভরণ-পোষণের দাতা মাত্র। কেহ যদি প্রকলোক প্রমাণ স্বূপ করে ভিক্ষুসভাকে বিবিধ দানীয়কল্প দান করে, তিনি উদার দায়ক হন মাত্র, বুদ্ধ শাসনের উত্তরাধিকারী হতে পারেন না। ধর্মী-দরিদ্র নির্বিষেয়ে যিনি ঐয় পুত্রকে প্রব্রজিত করে বুদ্ধশাসনে দান করেন, তিনিই কেবল বুদ্ধশাসনের উত্তরাধিকারী হন।' একথা শুনে সপ্তটি অশোক উৎকণ্ঠিত হয়ে বলেন, আমি এত দান করার পরও বুদ্ধশাসনের উত্তরাধিকারী হতে পারলাম না। অতঃপর, তিনি পুত্র-কন্যার সম্মতি নিয়ে তাঁদেরকে প্রব্রজিত করে সঙ্গে দান করেন বুদ্ধশাসনের উত্তরাধিকারী হন। প্রব্রজ্যার সুফল সম্পর্কে আরো বলা হয়ে থাকে যে, জন্মরূপের সর্বত্র বিহার নির্মাণ করিয়ে দান করলে যে ফল লাভ হয়, তা বুদ্ধশাসনের সন্তানকে প্রব্রজিত করে দান করলে সে ফলের ষোল ভাগের একভাগও হয় না।



### অনুশীলনমূলক কাজ

প্রবক্তার পাঁচটি সূত্র লেখ

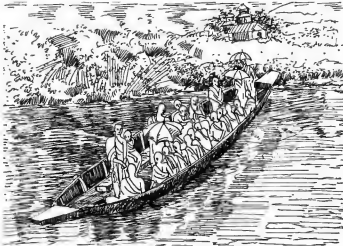
কী করলে বুদ্ধশাসনের উত্তরাধিকারী হওয়া যায়?

পাঠ : ৪

### উপসম্পদা

শ্রমণ থেকে ভিক্ষু হওয়ার যে অনুষ্ঠান তার নাম উপসম্পদা। উপসম্পদা হচ্ছে উচ্চতর নিয়ম-নীতি সম্পাদনের প্রক্রিয়া। প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয় সমাপ্তির পর উপসম্পদা দিতে হয়। মানসিকভাবে অসুস্থ, স্বপ্নহীন, রাষ্ট্রীয় দণ্ডপ্রাপ্ত প্রভৃতি ব্যক্তি উপসম্পদার যোগ্য নয়।

সরাসরি উপসম্পদা প্রদান করা হয় না। আগে প্রণীত হয়ে শ্রমণধর্মে দীক্ষিত হতে হয়। উপসম্পদার জন্য কমপক্ষে বিশ (কুড়ি) বছর বয়স হতে হয়। উপসম্পদা প্রার্থীকে মাতাপিতার অনুমতি নিতে হয়। অতঃপর ভিক্ষুদের ব্যবহার্য অটপরিষ্কার নিয়ে কোনো ভিক্ষুর শরণাপন্ন হতে হয়। সেই ভিক্ষুই সাধারণত তাঁর উপাখ্যায় বা গুরু হন। ভিক্ষুদের উপোসখের স্থান ভিক্ষুসীমায় বসে উপসম্পদা কার্য সম্পন্ন করতে হয়। কোনো বিহারে ভিক্ষুসীমা না থাকলে, যে নদী বা খালে জোয়ার ভাটা হয় সেখানেও উপসম্পদা দেয়া যায়। এখানে নৌকায় বসে কল্পণীয় সম্পন্ন করতে হয়। এর নাম 'উদকসীমা উপসম্পদা'।



উদকসীমায় উপসম্পদা প্রদান অনুষ্ঠান

উপসম্পদার জন্য কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুর প্রয়োজন হয়। প্রথমে প্রার্থীকে উপরে বর্ণিত দেয়সমূহ আছে কিনা জিজ্ঞেস করা হয়। তারপর অভিভাবকের মতামতের কথা জেনে উপসম্পদার অনুমতি প্রদান করা হয়। উপসম্পদা প্রার্থীকে উপসম্পদা প্রদান স্থানে বসে উপস্থিত ভিক্ষুদের সাহায্যে আনুষ্ঠানিকভাবে উপসম্পদা প্রার্থনা করতে হয়। প্রার্থনাটি নিম্নরূপ :

সজ্ঞং ভগ্নে উপসম্পদং যাচামি, উপসম্পদু মং ভগ্নে সংযো- অনুকম্পং উপাদায়।

দুতিবন্দি সজ্ঞং ভগ্নে উপসম্পদং যাচামি, উপসম্পদু মং ভগ্নে সংযো- অনুকম্পং উপাদায়।

তুতিবন্দি সজ্ঞং ভগ্নে উপসম্পদং যাচামি, উপসম্পদু মং ভগ্নে সংযো- অনুকম্পং উপাদায়।

**বাংলা অনুবাদ :**

মাননীয় সজ্ঞ, আমি উপসম্পদা প্রার্থনা করছি। উচ্চতর মার্গ লাভের জন্য অনুগ্রহ করে আমাকে উপসম্পদা দিন।

দ্বিতীয়বার সজ্ঞ, আমি উপসম্পদা প্রার্থনা করছি। উচ্চতর মার্গ লাভের জন্য অনুগ্রহ করে আমাকে উপসম্পদা দিন।

তৃতীয়বার সজ্ঞ, আমি উপসম্পদা প্রার্থনা করছি। উচ্চতর মার্গ লাভের জন্য অনুগ্রহ করে আমাকে উপসম্পদা দিন।

এরপর উপস্থিত সজ্ঞ সকলের সম্মতি সাপেক্ষে 'কর্মবাচ্য' পাঠ করে প্রার্থীকে উপসম্পদা প্রদান করেন। কর্মবাচ্য হলো ভিক্ষুর কর্মনীতির একটি অংশ। এর মাধ্যমে উপসম্পদা লাভকারী ভিক্ষু হিসেবে পরিচিত হন এবং সজ্ঞের সদস্য হন। উপসম্পদা লাভের পর হতে নিয়মিতভাবে ভিক্ষুসজ্ঞের জন্য অনুশীলনীয় সকল নিয়ম-নীতি পালন করতে হয়।

নব উপসম্পন্ন ভিক্ষু আচার্য বা গুরুর কাছে নিয়মিতভাবে ধর্ম বিনয় শিক্ষা করেন। প্রয়োজনে গুরুর অনুমতি সাপেক্ষে উপযুক্ত অন্য আচার্যের অধীনেও শিক্ষা লাভ করতে পারেন। একজন ভিক্ষুকে উপাধ্যায় ও আচার্যের কাছে শিক্ষানুরাগী হয়ে কমপক্ষে পাঁচ বছর থাকতে হয়। এ সময় তিনি ভিক্ষুদের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতিসমূহ চর্চা করেন। পাতিমোহক নামক প্রদেশে ভিক্ষুদের নিত্য প্রতিপাল্য ২২৭টি শীল বা অনুশীলনীয় নীতি বর্ণিত আছে। এগুলো প্রত্যেকটি স্বাধাধভাবে ভিক্ষুদের জানতে ও পালন করতে হয়।

**পাঠ : ৫**

### সজ্ঞদান ও অষ্ট পরিষ্কার দান

বৌদ্ধধর্মে দান হলো একটি অন্যতম আচরণীয় বিষয়। তাই নামাভাবে নানা আঙ্গিকে বৌদ্ধধর্মে দানের অনুশীলন হয়। তন্মধ্যে সজ্ঞদান এবং অষ্টপরিষ্কার দান অন্যতম। নিচে পৃথকভাবে সজ্ঞদান ও অষ্ট পরিষ্কার দান অনুষ্ঠানের বর্ণনা প্রদান করা হলো।

**সম্মদান** : সম্মকে উপলব্ধ করে দান করাই হলো সম্মদান। সম্ম বলতে ভিক্ষুদের সমষ্টিকে বোঝায়। কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুর একত্র করণকেই সম্ম বলা হয়। তথাগত বুদ্ধ বলেছেন, একজন ভিক্ষুকে দান দেয়ার চেয়ে সম্মকে উদ্দেশ্য করে দান করা উত্তম মঙ্গল। চতুর্থাংশ গ্রন্থে সম্মকে ‘অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র’ বা দানের উত্তম পাত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ সম্মকে দান করলে ইহ ও পরকালে সর্ববিধ পুণ্যফল লাভ করা যায়।

সম্মদান যে কোনো দিন গৃহে বা বিহারে করা যায়। সাধারণত গৃহেই সম্মদান করা হয়। তবে ভিক্ষুদের মধ্যাহ্ন আহারের পূর্বেই সম্মদান সম্পন্ন করতে হয়। বিভিন্ন উপলক্ষে সম্মদান আয়োজন করা যায়। যেমন : শিশুর জন্ম, অধ্বাসান, বিয়ে, গৃহ নির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য বা যে কোনো শুভ উদ্দেশ্যের প্রারম্ভ বা সাফল্য সম্মদান আয়োজন করা হয়। তবে পরিবারের কেউ মৃত্যুবরণ করলে অবশ্যই সম্মদান করতে হয়। আবার প্রয়াত জ্ঞাতিবর্গের সদগতি কামনা করে সম্মদান করা যায়। সম্মদানে কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুর উপস্থিতি আবশ্যিক। এ জন্য শ্রদ্ধাচিত্তে পাঁচজন বা ততোধিক ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করতে হয়। সম্মদানের দানীয় সামগ্রী দান চেষ্টায় প্রমুদচিত্তে সগ্রহে করতে হয়। সাধারণত, সম্মদানে রান্না করা খাদ্যদ্রব্য থেকে পুর করে ভিক্ষুদের নিতপ্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য সামগ্রী দান করা হয়। নিমন্ত্রিত ভিক্ষুগণের উপযুক্তভাবে বসার ব্যবস্থাসহ দানীয় বস্তু সুন্দরভাবে সাজিয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হয়। সম্মদান অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীল গ্রহণ করা হয়। তারপর ভিক্ষুগণ পরিষ্কার সূত্র পাঠ ও ধর্মদেশনা করেন। অতঃপর, একজন প্রাজ গৃহী সম্মদান্নের গাথা আবৃত্তি করে দানীয় সামগ্রী উৎসর্গ করেন। গাথাটি নিম্নরূপ :

‘ইমং ভিক্ষং সপরিচ্ছারং ভিক্ষুসম্মসং সেম, পুজ়েম।

দুত্তিয়সি ‘ইমং ভিক্ষং সপরিচ্ছারং ভিক্ষুসম্মসং সেম, পুজ়েম।

তত্তিয়সি ‘ইমং ভিক্ষং সপরিচ্ছারং ভিক্ষুসম্মসং সেম, পুজ়েম।

**বাংলা অনুবাদ :** নানবিধ উপকরণসহ এ দান ভিক্ষুসম্মকে দান দিলাম ও পূজা করলাম।

দ্বিতীয় বার নানবিধ উপকরণসহ এ দান ভিক্ষুসম্মকে দান দিলাম ও পূজা করলাম।

তৃতীয়বার নানবিধ উপকরণসহ এ দান ভিক্ষুসম্মকে দান দিলাম ও পূজা করলাম।

অতঃপর, ভিক্ষুসম্ম সমবেতভাবে করণীয় মেত্র সূত্রটি আবৃত্তি করেন। তারপর সম্মদানের পুণ্যফল ‘পুণ্যানুমেদন পাথা’ উচ্চারণের মাধ্যমে জল ঢেলে মৃত জ্ঞাতিবর্গ, সমবেত দেবতাগণ এবং সকল শ্রাণির উদ্দেশ্যে দান করা হয়। তারপর ভিক্ষুসম্মকে উত্তম খাদ্যদ্রব্য ঘরোয়া আশ্রয়ন করা হয়। শেষে আমন্ত্রিত জ্ঞাতি বন্ধুদের আশ্রয়ন করা হয়। সম্মদানের ফলে অশেষ পুণ্যরাশি অর্জিত হয়। বুদ্ধ বলেছেন, ‘পৃথিবী, সাগর, মেঘপর্বত যুগে যুগে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু লক্ষ কল্পেও সম্মদান্নে ফল ক্ষয় হয় না।

**অষ্ট পরিষ্কার দান :** এ দান অনুষ্ঠানও সম্মদান অনুষ্ঠানের মতো। তবে এ দানে ভিক্ষুদের নিত্য ব্যবহার্য অটচি বস্তু দান করা বাধ্যতামূলক। দ্রব্যসমূহ ভিক্ষুদের পরিচ্ছন্ন ও নিরোগ জীবন যাপনে সহায়ক। যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভিক্ষুদের নিত্য প্রয়োজনীয় অটচি দ্রব্য দান করা হয় তাকে অষ্টপরিষ্কার দানানুষ্ঠান বলা হয়। অষ্টপরিষ্কার বা অটচি দানের দানীয় দ্রব্য হলো : সন্ধ্যাটি, উত্তরাসন্ধ্যা, অন্তর্বাস, তিকাপাত্র, ছুরি বা ফল,

সূচ-সূতা, কটিবশ্মনী ও জলছাঁকনি। এগুলো ভিক্ষুদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। অষ্টপরিষ্কার দান করার সময় নিম্ন বর্ণিত গাথাটি আবৃত্তি করতে হয় :

ইমং ভিক্ষং অষ্টপরিষ্কারং ভিক্ষুসঙ্কসং দেম, পুজেম।

দুত্তরান্ধি ইমং ভিক্ষং অষ্টপরিষ্কারং ভিক্ষুসঙ্কসং দেম, পুজেম।

তত্তিরান্ধি ইমং ভিক্ষং অষ্টপরিষ্কারং ভিক্ষুসঙ্কসং দেম, পুজেম।

**বাংলা অনুবাদ :** এই অষ্ট প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দানীয় বস্তু ভিক্ষুসঙ্কে দান দিলাম ও পূজা করলাম।

দ্বিতীয়বার এই অষ্ট প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দানীয়বস্তু ভিক্ষুসংঘকে দান দিলাম ও পূজা করলাম।

তৃতীয়বার এই অষ্ট প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দানীয় বস্তু ভিক্ষুসংঘকে দান দিলাম ও পূজা করলাম।

যেহেতু, ভিক্ষুরা গৃহত্যাগী এবং ভিক্ষার নির্ভরশীল সেহেতু তাদের পক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয় অষ্টটি দ্রব্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই তাদের নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলো গৃহীদের দান করা উচিত। এ প্রসঙ্গে তথ্যগত সুস্থ বলাহেন -

স্ত্রীসংকলনং গন্তব্যং বাসী সূচি স্যবকলনং,

পরিসংকলনং সেনি দাযকো তুট্টমানসো,

যুজ্যোপেন সাসনে এবং হি দাতকং সদা।

**বাংলা অনুবাদ :** দায়ক সত্ত্বক মনে ত্রিচীবর, ভিক্ষাপাত্র, ছুর, সূচ, কটিবশ্মনী, জল ছাঁকনি ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে সর্বদা দান করা উচিত।

অষ্টপরিষ্কার দানের সুফল অনেক। নিচে অষ্টপরিষ্কার দানের কতিপয় সুফল বর্ণনা করা হলো :

- ১। ত্রিচীবর (সজাটি, উত্তরাসঙ্ক এবং অন্তর্বাস) দানের ফলে জন্মজন্মান্তরে কখনোই পরিষেয় ব্যত্রে র অভাব হয় না। তিনি সর্বদা সুন্দর বর্ণের অধিকারী হন।
- ২। ভিক্ষাপাত্র দানের ফলে দাতা জন্মজন্মান্তরে ধন-সম্পদের অধিকারী হন।
- ৩। ছুর দানের ফলে দাতা প্রজাবান হন।
- ৪। সূচ-সূতা দানের ফলে দাতা সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান এবং শিল্পকর্মে সুদক্ষ হন। তিনি সর্বত্র পূজিত হন।
- ৬। জল ছাঁকনি দানের ফলে দাতা ভয় ও রোগমুক্ত হয়ে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হন।

উপরে বর্ণিত অষ্টপরিষ্কার দানের ফল বিবেচনা করে প্রত্যেক বৌদ্ধকে জীবনে অন্তত পক্ষে একবার অষ্টপরিষ্কার দান করা উচিত।

#### অনুশীলনমূলক কাজ

কাদের অনুত্তর পূণ্যক্ষেত্র বলা হয়?

সঙ্কদানে কমপক্ষে কতজন ভিক্ষু উপস্থিত থাকতে হয়?

অষ্টপরিষ্কার দানের দানীয়বস্তু র একটি ভালিকা প্রস্তু ত কর।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। উপসম্পদা লাভের ন্যূনতম বয়স কত ?

ক. ৭ বছর

খ. ১৯ বছর

গ. ২০ বছর

ঘ. ২৯ বছর

২। নির্বাণে উপনীত হওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য -

ক. শীল পালন

খ. সংসার ত্যাগ

গ. কুশল কর্ম সম্পাদন

ঘ. প্রব্রজ্যা গ্রহণ

নিচের তালিকাটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

| ক্রমিক নং | দানীয় বস্তু                 |
|-----------|------------------------------|
| ১.        | সম্মতি, উত্তরাসক্ত ও অন্তরীস |
| ২.        | ভিক্ষাপাত্র                  |
| ৩.        | কর                           |
| ৪.        | সূঁচ-সূতা                    |
| ৫.        | কটিবন্ধনী                    |
| ৬.        | জল ছাকনী                     |

৩। তালিকায় বর্ণিত বস্তু ঘরী কোন দান সম্পাদন করা যায় ?

ক. সঙ্ঘ দান

খ. অষ্টপঞ্জিকার দান

গ. চীবর দান

ঘ. পিণ্ডদান

৪। উক্ত দান সম্পাদনের ফলে বৌদ্ধরা লাভ করবে -

i. শান্তি ও সমৃদ্ধি

ii. সামাজিক মর্যাদা

iii. জীবনে বহুবিধ উন্নতি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

### সৃজনশীল প্রশ্ন :

১। অংকাসিং মারমা একজন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। জে.এস.সি পরীক্ষার পর পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজন নিয়ে বিহারে উপস্থিত হয়। নিজ ব্যবহার্য জিনিসপত্র ও অন্যান্য দানীয় বস্তু সামনে রেখে সবাই পঞ্চমীল গ্রহণ করলেন। শ্রম্বেয় ভাস্কর আদেশে অংকাসিং মারমা আরও কেসা, লোমা, নখা, দস্তা, তচো এই কথাপুলো ভাস্কর সূত্রে সূত্রে উচ্চারণ করেন। এরপর পনের দিন যাবৎ বিহারে অবস্থান করে নিজ কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয়। তার জীবনের অনেক পরিবর্তন আসে।

- ক. কতজন ভিক্ষুর উপস্থিতিতে সজ্ঞাদান করা হয় ?
- খ. সাত বছরের কম বয়সের ছেলেকে প্রব্রজ্যা দেওয়ার বিধান নেই কেন ? ব্যাখ্যা কর।
- গ. অংকাসিং মারমা ভাস্কের নিকট যে দীক্ষা নিল তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উক্ত দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে অংকাসিং মারমা কী সুফল লাভ করবে – বিশ্লেষণ কর।

২। **ঘটনা-১ :** অন্তর বাড়ুয়া পোশাক দিন মজুর। তা সন্তোষ পিতার বাৎসরিক তিথিতে ভিক্ষু সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করে যথাসময়ে পিতৃদান দিলেন।

**ঘটনা-২ :** প্রতীক চাকমা চিকিৎসার জন্য ভারতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। তিনি রাজবন বিহারে গিয়ে শ্রমেয় ভিক্ষুদের অপরিহার্য জিনিস দান করার জন্য মনোনিবেশ করলেন। তিনি নির্দিষ্ট সময়ে রাজবন বিহারে গৌছে উক্ত দানকার্য প্রকৃতিতে সম্পন্ন করেন।

- ক. শ্রমণ থেকে ভিক্ষুকে উপনীত হওয়ার নাম কী ?
- গ. ঘটনা-২ কোন দানের সাথে সম্পৃক্ত ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ঘটনা-১ ও ঘটনা-২ এর মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

**সূন্যস্থান পূরণ কর :**

১. গৌতমবুদ্ধ ..... সূত্রে সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণের উপদেশ দিয়েছেন।
২. পরিবারিক জীবন ভাঙ্গ করে বৌদ্ধ রীতিতে সন্ন্যাস অবলম্বনের নাম .....।
৩. প্রব্রজ্যা প্রার্থীকে প্রথমে ..... অনুমোদন নিতে হয়।
৪. প্রব্রজ্যা এক প্রকার ..... জীবন পরিচরিত।
৫. উপসম্প্লা হলো উচ্চতর নিয়ম-নীতি সম্পাদনের .....।
৬. সঙ্ঘকে উপলব্ধি করে দান করাই হলো .....।

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. কীভাবে কোন জাতির উন্নতি ছাড়া কখনো অবনতি হয় না?
২. কত বছরের কম বয়সে প্রব্রজ্যা দেওয়ার বিধান নাই এবং কেন?
৩. কেন সরাসরি উপসম্প্লা প্রদান করা হয় না?
৪. 'পিতৃদান' কী?

**রচনামূলক প্রশ্ন :**

১. ধর্মীয় আচর-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কীভাবে সামাজিক সম্প্রীতি সুদৃঢ় হয় লেখ।
২. প্রব্রজ্যা গৃহীদের জন্য কেন সর্বোচ্চ মঙ্গল কাজ বর্ণনা কর।
৩. উপসম্প্লা গ্রহণের নিয়মসমূহ লিপিবদ্ধ কর।
৪. সজ্ঞাদান ও অষ্টগরিষ্কার দানের পরিচয়সহ এ দুইয়ের মধ্যে মিল ও অমিলগুলো লেখ।

## অষ্টম অধ্যায়

### চরিতমালা

বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের খের-খেরীর অবদান অপরিণীম। ভিক্ষু-ভিক্ষুণী হিসেবে যারা দশ বছর জীবন অতিবাহিত করেছেন তাদেরকে খের ও খেরী বলা হয়। খেরকে সখবিরও বলা হয়। সখবির অর্থ সাধনায় সিংহত থাকা। খের, খেরী, সখবির প্রভৃতি উপাধি বিশেষ। প্রবীণ, জ্ঞানী ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ এসব উপাধি প্রাপ্ত হন। মহৎ কর্মগুণে তাঁরা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তাঁরা কীভাবে মহৎ জীবন গঠন করেছিলেন তার বর্ণনা বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায়। তাঁদের জীবনী এবং ভাষিত গাথাগুলো আমাদের নৈতিক জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ করে। বুদ্ধের সময় ও বুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অনেক বৌদ্ধ মনীষী বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যের বিকাশে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁদের জীবন দর্শন থেকেও অনেক কিছু শেখার আছে। জীবনকে সুন্দর করার জন্য সেসব খের-খেরী ও বরণ্য মনীষীদের জীবন চরিত পাঠ করা উচিত। এ অধ্যায়ে আমরা সখবির অনুবুদ্ধ, সখবির অঙ্গুলীমাল, মহিয়সী নারী মল্লিকা দেবী এবং বিখ্যাত অট্টকথা রচয়িতা বুদ্ধমোঘ সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- \* খের-খেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের জীবনী ব্যাখ্যা করতে পারব।
- \* খের-খেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের অবদান মূল্যায়ন করতে পারব।

পাঠ : ১

### সখবির অনুবুদ্ধ

সখবির অনুবুদ্ধ সন্ন্যাসী এক বুদ্ধ শিষ্যের নাম। তিনি একান্ত প্রচেষ্টা ও আহুত্যাগের মাধ্যমে এই পৌরব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর জন্য তাঁকে জন্ম-জন্মান্তরে সাধনা করতে হয়েছে। তিনি এক এক জন্মে এক এক নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে। পৌত্তম বুদ্ধের পূর্ববর্তী বুদ্ধদের একজন ছিলেন পদুমুত্তর বুদ্ধ।

পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে তিনি এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মশ্রবণের জন্য একদিন তিনি বিহারে গিয়েছিলেন। তখন পদুমুত্তর বুদ্ধ নিষ্যচকুসল্লু এক ভিক্ষুকে ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের নিয়োগ দান করেন। তিনিও সেই পদ গ্রাণী হয়ে বুদ্ধ প্রমুখ লোক ভিক্ষুকে এক সপ্তাহ ধরে দান করেন। পদুমুত্তর বুদ্ধ তাঁকে আশীর্বাদ করলেন যেন পৌত্তম বুদ্ধের সময়ে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

পরে কশ্যপ বুদ্ধের সময় বারাগসীতে এক ধনী পরিবারে তিনি জন্ম নেন। কশ্যপ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ কালে তিনি কনকচৈত্যের চারদিকে মৃতপূর্ণ তাম্রশায়ে প্রদীপ পূজা করেছিলেন। সে যত্নভাও মাথায় ধারণ করে সন্ন্যাসীতে চৈত্য প্রদক্ষিণ করেন। মৃত্যুর পর তিনি সেবলোককে উৎসন্ন হন। সেখান থেকে আয়ুশেষে পুনরায় বারাগসীতে এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেন। তখন তাঁর নাম রাধী হয়েছিল অমৃতভার। তিনি সুধম নামক এক শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে কাজ করতেন। একদিন উপরিইষ্ট নামক এক পছেকবুদ্ধ ভিক্ষা করেছিলেন। পছেকবুদ্ধকে

দেখে অনুভার নিজের খানের অংশ তাঁকে দান করে দেন। প্রচাচ শ্রম্ভাবশত গৃহপুত্রীর অংশও দান করে দেন। নিজেনের জন্য বিন্দু মাত্র অবশিষ্ট না রেখে দান করে দেয়া এক বিরল ঘটনা। এ ঘটনা দেখে দেবতারও বিমিত হলেম।

শ্রেষ্ঠী অনুভারের উত্তম দানের কথা শুনে তিনি অনুভারকে একহাজার মুদ্রা পুরস্কৃত করলেন। মনে মনে তিনিও এর পুণ্যার্থে কামনা করেন। সেদিন থেকে শ্রেষ্ঠী অনুভারকে গৃহকর্ম করতে দিতেন না। তিনি অনুভারকে বাণিজ্যকর্ম দ্বারা জীবন যাপন করতে বলেন। একদিন রাজদর্শনে যাবার সময় শ্রেষ্ঠী অনুভারকে সঙ্গে নিলেন। রাজা শ্রেষ্ঠীর প্রতি করুণা প্রদর্শন করলেন। শ্রেষ্ঠী রাজ্যকে বললেন, মহারাজ অনুভার অত্যন্ত পুণ্যবান। আমি একহাজার মুদ্রা নিয়ে তাঁর কাছ থেকে পুণ্যার্থ গ্রহণ করেছি।

রাজাও সবুট হয়ে অনুভারকে একহাজার মুদ্রা প্রদান করলেন। তাঁকে পছন্দমত একটি স্থান নির্বাচন করে বসতি স্থাপন করে বাণিজ্যকর্ম দ্বারা জীবন যাপন করতে উপদেশ দিলেন।

অনুভার সেদিন পছন্দে বৃক্ষকে পিতদান করেছিলেন সেদিন থেকে পুণ্যফল ভোগ করতে থাকেন। রাজার নির্দেশে তিনি বাড়ি তৈরির জন্য নির্দিষ্ট স্থান পরিষ্কার করেছিলেন। উঁচু নিচু স্থান সমতল করার সময় নিখিল উঠতে লাগল। সে ধনরত্নের কলসে সমস্ত স্থান পূর্ণ হলো। তিনি তা দেখে রাজাকে সবদা দিলেন। রাজা সে ধনসম্পদ দেখে সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, এবুধ ধন আমার রাজ্যে অন্য কারও আছে কি? সকলে একবাক্যে উত্তর দিল— না মহারাজ, কারও নেই। সেদিন থেকে তাঁর নাম রাখা হয় ধনশ্রেষ্ঠী।

এভাবে তিনি বহু জন্ম কুশলকর্ম সম্বাদন করেন। অতঃপর গৌতম বৃক্ষের সময় কপিলাকু নগরে শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মেই তার নাম রাখা হয় অনুবৃক্ষ। পিতার নাম ছিল অমিতোদন। অমিতোদন ছিলেন রাজা সুশোভনের ভাই। অনুবৃক্ষের চেহারা ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও কোমল। এ মহাপুণ্যবান ব্যক্তি পরম সুখেই দিন যাপন করেছিলেন। পিতা তার জন্য তিন ষাড়ুর উপযোগী তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি দেবকুমারের ন্যায় দিব্যসুখ ভোগ করতে থাকেন। একদিন তিনি রাজা সুশোভনকে কর্তৃক উৎসাহিত হয়ে ভদ্রিকুমার প্রভৃতির সঙ্গে অনুগ্রহ অশ্রবনে গমন করে বর্ষাকালেই প্রব্রাজ্য গ্রহণ করেন। সেই বর্ষার মধ্যেই তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। তারপর ধর্মসেনাপতি সারিপুত্রের নিকট কর্মস্বধন ভাবনা গ্রহণ করে প্রাচীনবংশ নামক বনে গমন করেন। একদা তিনি সন্তমহাপুরুষ বিতর্ক সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন। কিন্তু তিনি অষ্টম বিতর্ক কিছুতেই করতে পারছিলেন না। বৃক্ষ তাঁকে তা জ্ঞাপন করে আর্ববংশ সূত্র দেশনা করেন। অনুবৃক্ষ সেই দেশনা অনুসারে ভাবনা করে অর্হত ফল লাভস্বর্বক অনেক প্রীতিগাথা ভাষণ করেন। নিচে তাঁর ভাষিত গাথার সারমর্ম দেয়া হলো :

‘প্রতিদিন আমি’ নৃত্য-গীত দ্বারা পুঞ্জিত হতাম। সকালে নৃত্যভঙ্গে আমাকে জাগ্রত করা হতো। এই ভোগ-বিলাসিতা দ্বারা আমি শৃঙ্খলিত করতে পারিনি। এসব ভোগ-বিলাস ভোগ করে আমি বৃক্ষশাসনে প্রব্রজিত হই। বৃগ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ ভোগ করে ধ্যান করতে শুরু করি। এভাবে আমি আসক্তি মুক্ত হই। যিনি যথালব্ধ যত্ন স্তে সন্তুষ্টি থাকেন, বিক্ষিপ্ত চিত্ত সংযত করেন, আলস্য ভ্যাগ করে উদ্যমশীল হন, তাঁর বোধিপক্ষীয় কুশলধর্মগুলো উৎপন্ন হয়। যখন আমার চিত্তে বিতর্ক উদ্ভিত হয়েছিল তখন তথাগাত বৃক্ষ আমাকে ধর্ম-দেশনা করেন। আমি তাঁর ধর্ম-দেশনা অনুসরণ করে ত্রিবিধ বিদ্যা লাভ করে বৃক্ষশাসনে কৃতকার্য হই।



পাঠ : ২

## স্বর্গের অঞ্জলিমাল

কোশলরাজ প্রচলিতরাজ্যের রাজপুরোহিত ছিলেন ভার্গব নামে এক ব্রাহ্মণ। সেই ব্রাহ্মণের ঘরে অঞ্জলিমালের জন্ম। ব্রাহ্মণ পুত্রসন্তান লাভ করে অত্যন্ত আনন্দিত হন। অঞ্জলিমাল পূর্ব বৃন্দাবনের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে পৌত্তম্যবৃন্দাবনের সময় এ রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মকালে সমস্ত নগরের অস্ত্র শস্ত্র সমুদ্রে উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করল। শয়ন কক্ষে রাজার মঞ্চলগ্ন্যুৎপত্তি হতে জ্যোতি বের হলো। এতে রাজা ভীত সন্ত্রস্ত হন। সারারাত রাজার ঘুম হলো না। পুরোহিত এই লক্ষণ দেখে চিন্তিত হলেন। তিনি শাস্ত্র পর্ষ্যলোচনা করে তাঁর হেলের জন্ম নক্ষত্র জ্ঞাত হলেন। অতঃপর তিনি সকালে রাজাকে দর্শন করতে পেলেন। আলোচনার পরে জানতে পারলেন রাজা সারারাত ঘুমতে পারেননি। রাজা পুরোহিতের নিকট অস্ত্র চাণ্ডালে আপনাদের মূল্যবোধ ওঠার কারণ জানতে চাইলেন। পুরোহিত বললেন, ‘মহারাজ! ভয় করবেন না। আমার এক পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছে। তাঁর নক্ষত্রে তাঁর জন্ম তাই এতদূর অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছে।’

রাজা বললেন, ভবিষ্যতে সে কেমন হবে? পুরোহিত বললেন, মহারাজ, তাঁর নক্ষত্রে জন্ম হওয়ায় সে ভবিষ্যতে দস্যু হবে। রাজা আবার জিজ্ঞাস করলেন, সে একাকী দস্যু হবে নাকি দলবদ্ধ হয়ে দস্যুত্বা করবে? পুরোহিত বললেন মহারাজ, একাকী করবে। তখন রাজা জিজ্ঞাস করলেন, তাকে হত্যা করব কি? এ প্রশ্নে পুরোহিত নীরব রইলেন। রাজা পুনরায় বললেন, ‘যদি একাকী দস্যুতা করে সে কী আর করতে পারবে? তাকে দমন করার শক্তি কোশল রাজার আছে। তাকে আপনি পালন করতে পারেন।’ কোশল রাজার অনুমতি পেয়ে পুরোহিত তাঁর পুত্রকে পালন করতে লাগলেন। জন্মকালে রাজার মনে দুঃখ দিয়েছিল বলে এ শিশুর নাম রাখা হয় ‘হিংসক’। কিন্তু পরে তাঁর আচার-আচরণে মুগ্ধ হয়ে সবাই তাকে ‘অহিংসক’ নামে ডাকত। পুষ্কিনের সুকর্মে ফলে তাঁর দেখে সন্ত হস্তী বল ছিল।

অহিংসককে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশীলায় পাঠানো হলো। সে পাঠে অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে ওঠে। সে সময়ের রীতি অনুসারে আচার্যের সেবায়ও সে খুব দায়িত্বশীল ছিল। সে আচার্য ও তাঁর পত্নীকে যত্ন সহকারে সেবা করত। অল্প সময়ের মধ্যে সে সকল শাস্ত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিল। সমগ্র বিদ্যালয়ে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। ব্রাহ্মপত্নীও তাকে খুব আদর-যত্ন করতেন। কিন্তু অন্যান্য ছাত্রদের তা সহ্য হতো না। তারা যড়যন্ত্র করে এবং মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে আচার্যের কান ভারী করে তুলল। আচার্য ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে চরম শাস্তি প্রদানে উদ্যত হলেন।

আচার্য ভাবলেন, অহিংসক খুব শক্তিশালী ও মেধাবী। তাকে কৌশলে মেরে ফেলতে হবে। একদিন ছুটি হলে কুমার অহিংসক নগরে যাচ্ছিল। এ সময় আচার্য তাকে ডেকে বললেন, দেব, তোমার বিদ্যাশিক্ষা শেষ হয়েছে। আমাকে গুরুদক্ষিণা দিয়ে তোমার এখন নিজগৃহে যাওয়া উচিত। অহিংসক বলল, ‘আচার্য! উত্তম কথা।’ আপনাকে কিভাবে দক্ষিণা দেব? আচার্য বললেন, ‘আমাকে দক্ষিণাঅর্থাৎ মানুষের ডান হাতের এক হাজার বৃন্দাঞ্জলি দিতে হবে।’ আচার্য ভেবেছিলেন নরহত্যা করলে লোকে তাকে মেরে ফেলবে।

অহিংসক গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে নিল। গুরুর ইচ্ছা পূরণে সে তৎপর হলো। অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জাগিনী বনে বাসস্থান তৈরি করল অহিংসক। এ বনটি ছিল অটটি রাজ্যের চলাচলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

বহুলোক এই পথ দিয়ে আসা-যাওয়া করত। এ বনে অবস্থান করে সে পুত্রকে দক্ষিণা দেয়ার জন্য নরহত্যা শুরু করল। অহিংসক একেকটি নরহত্যা করে বৃন্দাঙ্গুলি কেটে মালা আকারে গোঁখে গলায় ধারণ করত। সেজন্য সে অঙ্গুলিমাল নামে পরিচিতি লাভ করে। এ সংবাদ ক্রমে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

অঙ্গুলিমালের নৃশংসতায় কৌশল রাজ্যের জনগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হলো। সকলের মনে দাখল উৎকর্ষ। সবাই মরণভয়ে ভীত। কৌশলরাজ প্রসেনজিভের কাছে এ সংবাদ প্রেরণ করা হলো। তিনি নরহত্যাক দুসংকে ধরার জন্য কিছু সৈন্য প্রেরণ করলেন।

পুত্রের প্রাণ রক্ষার জন্য পিতা কোনো চেষ্টাই করলেন না। কিন্তু মা মজানী ছেলের এ বিপদে অস্থির হলেন। শেষে পাগলিনীর মতো ছুটে চললেন জালিনী বনের দিকে। পথিকরা কত নিষেধ করল। সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই। দম্ভা হলেও নিজের পুত্র। তাঁর জীবন রক্ষা করতেই হবে।

সে সময় ভগবান বৃন্দ জেতবনে অবস্থান করছিলেন। তিনি দিব্যজ্ঞানে অবগত হলেন যে, অঙ্গুলিমাল পূর্বজন্মের বহু সুকৃতির অধিকারী। এই মুহূর্তে ধর্মবান্ধী শ্রবণ করলেই তার জানচক্ষু উৎপন্ন হবে। তখন বৃন্দ অঙ্গুলিমালের পাশবিক শক্তিকে দমন করার জন্য মনস্থির করলেন। মাতৃহত্যা মহাপাপ। এ মুহূর্তে মাতৃহত্যা তার পূর্বজন্মের সুফলকে শান করে দেবে। তার জানচক্ষু লাভ স্রিতরে বৃন্দ হবে। সে আজ নিজ মাতাকে হত্যা করে গুরুদক্ষিণা দেবে। বৃন্দ সে নারীর প্রাণরক্ষার্থে এবং অঙ্গুলিমালকে মাতৃহত্যাজনিত পাপ হতে রক্ষা করার জন্য ঘটনাস্থলে যাত্রা করলেন। সে দিনটি ছিল অঙ্গুলিমালের নরহত্যার শেষ দিন। সে নয়শ' নিরানব্বইটি মাংসের বৃন্দাঙ্গুলি সংগ্রহ করেছে। মাত্র আর একটি বাকি। একজন লোক হত্যা করতে পারলেই তার বাসনা পূর্ণ হবে। অঙ্গুলিমাল তার মাতাকে দূর থেকে আসতে সেবল। তখন অঙ্গুলিমালের মনে মাতা-পুত্রের সম্পর্কের গেশমাত্র প্রভাব নেই। অঙ্গুলি সংগ্রহই তার প্রধান লক্ষ্য। সে খড়্গ তুলে তার মায়ের দিকে ধাবিত হলো। ঠিক সে সময় সমগ্র বনভূমি আলোকিত করে বৃন্দ অঙ্গুলিমালের সামনে আবির্ভূত হলেন। এ সময় অঙ্গুলিমাল চিন্তা করল এ বৃন্দ নারীকে হত্যার পূর্বে মুড়িতকেশ সৈরিক বসনধারী তিক্কে হত্যা করব। এরূপ ভেবে আবার বৃন্দের দিকে ছুটেতে লাগল। কী আশ্চর্য! ক্রমাগত ছয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করেও সে বৃন্দকে ধরতে পারছিল না।

সে ক্লান্ত হয়ে ভাবল আমার দুতগামী অশুকে ধরতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু আমি একজন শ্রমণকে ধরতে পারছি না। আশ্চর্য ব্যাপার! এরূপ চিন্তা করে অঙ্গুলিমাল বিকট চিৎকার করে বলল, দাড়াও শ্রমণ। ভগবান বললেন, 'অঙ্গুলিমাল, আমি স্থির আছি, তুমি স্থির হও।' বৃন্দের একথা শুনে সে চিন্তা করল, শ্রমণগণ সত্যবাদী, অঘট স্থির হওয়ার জন্য আমাকে বলছেন। তার কারণ কী?

সে আর এক পাও অগ্রসর হতে পারল না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

বৃন্দ বললেন, 'আমি সর্বদা প্রাণীদের প্রতি দত্তদান থেকে বিরত থাকি। তাই স্থির। তুমি প্রাণী হত্যায় নিয়তরত আছ। তাই অস্থির। তা শুনে অঙ্গুলিমালের পাশাপাশি হৃদয় কল্পগারসে সিক্ত হলো। স্তম্ভ ভূমিতে নিক্ষেপ করল। বৃন্দকে বন্দনা করে গুরুত্ব প্রার্থনা করল।

বৃন্দ 'এসো তিক্কে' বলার সঙ্গে সঙ্গে ঋষিময় পাত্র টীবর লাভ করে উপসম্পদা প্রাপ্ত হলেন। পরে ভাবনা বলে অর্হত মনে প্রতিষ্ঠিত হন। অর্হত লাভ করে তিনি বিমুক্তি সুখে অনেক আনন্দপাথা উচ্চারণ করেছিলেন। নিচে তাঁর ভাষিত পাথাগুলোর সারমর্ম দেয়া হলো :

‘আমার কারণে যারা জাতি বিরোধে দুঃখ ভোগ করেছেন তারা আমার ধর্মকথা শ্রবণ করুন। আমার বাক্য শুনে সকলে বুদ্ধ শাসনে সংস্কার সম্পাদনে নিযুক্ত হোন। ধার্মিক কল্যাণ মিত্রের সেবা করুন। যাঁরা ক্ষতিগীর্ণতার কথা বলেন, মৈত্রী ধর্মের প্রশংসা করেন তাঁদের নিকট ধর্ম শ্রবণ এবং যথাধর্ম আচরণ করুন। কাউকেও হিংসা করবেন না। নির্বাণ প্রাপ্ত হয়ে সকল প্রাণীকে নিজের সন্তানের মতো প্রতিপালন করবেন। হস্তীকে অজুশ ঘারা, অশুকে কশাঘাত ঘারা দমন করে। পণ্ডিতগণ নিজেকে অর্হন্ত ফলের ঘারা দমন করেন। আমি বুদ্ধ কর্তৃক বিনা দণ্ডে দমিত হয়েছি। পূর্বে আমার নাম হিংসক হলেও আমি অহিংসক নামে পরিচিত ছিলাম। আজই আমার অহিংসক নাম সত্যে পরিণত হয়েছে। আমি আর কাউকে হিংসা করি না।’

### অনুলীনমূলক কাজ

অজুসিমালের জন্মের সময় কী হয়েছিল লেখ

আচার্য গুরুদক্ষিণা স্বরূপ অজুসিমালের নিকট কী যাচনা করলেন

### পাঠ : ৩

### মহাপ্রজাপতি গৌতমী

মহাপ্রজাপতি সুপ্রবুদ্ধের পরিবারে দেবদহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রানি মহামায়ার কনিষ্ঠ বোন ছিলেন। রাজা শুশোদন দুই বোনকেই বিয়ে করেন। জ্যোতিষীগণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের সন্তান রাজ্যক্রান্তরী রাজা হবেন। সিংধার্ষ গৌতমের জন্মের সপ্তাহকাল পরে তাঁর মাতা রানি মহামায়ার মৃত্যু হয়। মহাপ্রজাপতি গৌতমীই সিংধার্ষের লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নন্দের মাতা। কথিত আছে, তিনি নিজ পুত্রের দেখাশোনার ভার হাতীর গুপ অর্পণ করে নিজে সিংধার্ষ গৌতমকে প্রতিপালন করতেন। গৌতম সিংধার্ষের গোত্রের নাম। গৌতমের লালন-পালনকালী হিসেবে তিনি মহাপ্রজাপতি গৌতমী নামে পরিচিতি লাভ করেন।

পরিণত বয়সে রাজা শুশোদনের মৃত্যু হয়। এতে রাজা ও সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠেন মহাপ্রজাপতি গৌতমী। এসময় তিনি সন্ন্যাস জীবন লাভে আগ্রহী হলেন। এর জন্য কীভাবে কী করা যায় তিনি চিন্তা করতে লাগলেন।

সেসময় শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে রোহিনী নদীর জল নিয়ে বিবাদ হয়েছিল। বুদ্ধ সে বিবাদ মীমাংসার জন্য বৈশালী থেকে কলিগাবল্লু যান। এতে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর আকর্ষিত সুযোগ উপস্থিত হয়। বিবাদ মীমাংসা হলে বুদ্ধ তাদেরকে কলহবিবাদ সূত্র দর্শনা করেন। এসময় পাঁচশত শাক্যকুমার ভিক্ষুসঙ্গে যোগদান করেন। তাদের স্বীকৃত মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নেতৃত্বে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুদ্বীপে গ্রহণ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু বুদ্ধ তাঁদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বৈশালীতে চলে যান। মহাপ্রজাপতি ও তাঁর সহচরীগণ হতাশ না হয়ে কেশ কটন এবং কবায়বস্ত্র পরিধান করে বৈশালী পর্যন্ত বুদ্ধের অনুগমন করেন।

তারা কতবিকত পায়ে বিহারে উপস্থিত হয়ে দ্বিতীয়বার বুশ্বকে অনুরোধ জানান। শেষে আনন্দ ঘের তাঁদের ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষা দেয়ার জন্য বুশ্বের কাছে প্রার্থনা জানান। অবশেষে বুশ্ব প্রার্থনা অনুমোদন করলে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর বাসনা পূর্ণ হয়। নারীগণ সম্মত হওয়ার সুযোগ পেলেন। তিনি প্রহরজ্যা লাভ করলেন।

দীক্ষার পর তিনি বুশ্বের কাছে উপস্থিত হয়ে বন্দনা করেন। বুশ্ব তাঁকে ধর্মোপদেশ দান করেন। তিনি ধর্মোপদেশ অনুসরণ করে অর্হত ফল লাভ করেন। তার পাঁচশত সহচারিণী জেতবনে বুশ্বের নিকট নন্দকোবাদ সূত্র শ্রবণ করে অর্হত ফল লাভ করেন। বুশ্ব মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে জাসে খেরীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেন। বৈশালীতে অবস্থানকালে মহাপ্রজাপতি গৌতমী নির্বাণ লাভ করেন।

তিনি বুশ্বের অনুমতি গ্রহণ করে নানাবিধ ঋশি প্রদর্শনের পর দেহত্যাগ করেন। কথিত আছে, বুশ্বের মহাপরিনির্বাণের সময় যেসব অশুভ ব্যাপার সংঘটিত হয়েছিল সেসব মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অস্তেফিক্রিয়াও সংঘটিত হয়েছিল। যেমন সকলের প্রার্থনা শেষে তাঁর শ্মশান ঋষি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। মহাপ্রজাপতি অর্হত প্রাপ্তির পর মনের সুখে অনেক ত্রীতিগাথা উচ্চারণ করেছিলেন। নিচে তাঁর ভাষিত কয়েকটি গাথার বাংলা অনুবাদ দেয়া হলো :

১. সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা বুশ্ববীরকে নমস্কার করছি। তিনি আমার এবং অন্যান্য বহুজনের দুঃখমোচন করেছিলেন।
২. সর্বদুঃখের কারণ আমার জাত হয়েছে। অশুভের হেতু আমার তৃষ্ণা এখন বিলুপ্ত হয়েছে। আমি দুঃখের নিবৃত্তির কারণ অর্হ অষ্টাঙ্গিক মার্গে বিচরণ করছি।
৩. পূর্বে আমার জ্ঞান অপরিস্রব ছিল। তাই আমি লঙ্কাহীনভাবের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, মাতামহীবৃন্দে কতবার জন্মেছি।
৪. সর্বদা শ্রাবক সত্ত্বের গুণাবলির দিকে লক্ষ রাখবে। তাঁরা দুঢ় পরাক্রমশালী, উদ্যমশালী, ধ্যানপরায়ণ ও বীরবান। তাঁরা সজ্জবান্ধবের বিচরণশীল। তাঁদের পথ অনুসরণ করবে।
৫. কী আশ্চর্য! বহুজনের হিতার্থে মহামায়া সিম্বধ্বর্ষকে প্রসব করেছিলেন। সত্যিই তিনি কত গুণের আধার। সেই গৌতম জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর হাত থেকে প্রাণীগণকে রক্ষা করেছেন। সকল দুঃখের বিনাশসাধন করেছেন।

### অনুশীলনমূলক কাজ

‘মহাপ্রজাপতি গৌতমী’ কীভাবে নামকরণ হয় দেখ।

নারীদের সম্মত করার জন্য কে বুশ্বের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন?

## পাঠ : ৪ মল্লিকাদেবী

পুণ্যশীলা মল্লিকাদেবী কুশীনগরে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাঁর সঙ্গে বংশুল সেনাপতির বিয়ে হয়। তিনি বিয়ের পর স্বামীর কর্মসম্মল কোশল রাজ্যে গমন করেন। বংশুল ছিলেন কোশলরাজ প্রসেনজিতের সেনাপতি। শ্রুতস্বতীর জেতবনে ভগবান বুদ্ধ যখন অবস্থান করতেন মল্লিকাদেবী সেনাপতির স্ত্রী হয়েও দিনে দু'বার ত্রিগড়ের সেবা করতে বিহারে যেতেন।

মল্লিকাদেবী বুদ্ধসহ বিহারের সকল ভিক্ষুসংঘকে সকালে প্রাতঃরাশ দান করতেন। বিকালে ধর্ম শ্রবণের সময় তাঁদের জন্য পানীয় ও পঞ্চ ভৈষজ্য নিয়ে যেতেন। এছাড়া তাঁদের গৃহেও পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও অষ্টমী তিথিতে ছাদ্যভোজ্য দান করা হতো।

দীর্ঘকাল সংসার করেও মল্লিকাদেবীর কোনো সন্তান হলো না। তিনি নিরুপদান বলে তাঁর স্বামী তাঁকে পিতৃগৃহে চলে যেতে বললেন। স্বামীর আদেশ মেনে নিয়ে তিনি পিতৃগৃহে কুশীনগরে রওনা হলেন। যাবার পথে শ্রামস্তীর জেতবনে বিহারে তিনি বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করলেন। বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে তিনি স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে মন স্থির করলেন। তখন তিনি পিতৃগৃহে না গিয়ে স্বামীগৃহে ফিরে গেলেন। তাকে দেখে বংশুল সেনাপতি বললেন, ফিরে এসে কেন? মল্লিকাদেবী বললেন, ভগবান বুদ্ধ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

বংশুল সেনাপতি চিন্তা করলেন তথাগত ভবিষ্যত দুষ্টি। হয়তো আমার বংশ রক্ষা হবে। তাই তিনি মল্লিকাকে আমার নিকট ফেরত পাঠিয়েছেন। কিছুদিন পর মল্লিকা সন্তানসম্ভবা হলেন। তাঁর দুটি যমজ সন্তান হলো। এভাবে বংশুলের ঊরসে মল্লিকার গর্ভে যোলাবার যমজ সন্তান হয়েছিল। প্রত্যেকেই সূত্রাম দেহের অধিকারী ছিলেন। যথাসময়ে তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। তাঁরা এক সঙ্গে রাজবাড়িতে গুলে রাজ্যান পূর্ণ হয়ে যেত। বিচারালয়ের বিচারকার্য থেকে আরম্ভ করে সর্বত্র বংশুল সেনাপতির জয়ধ্বনি যেমিত হলো।

কোশলরাজ প্রসেনজিতের মনে এক সময় সন্দেহ জাগ্রত হলো। একদিন এ বংশুল সেনাপতিই হয়তো রাজশক্তি কেড়ে নিতে পারে। তাই রাজা ষড়যন্ত্র করে বংশুল সেনাপতি ও তাঁর বত্রিশ পুত্রকে হত্যা করলেন।

যেদিন তাঁদের সবাইকে হত্যা করা হলো সেদিন মল্লিকাদেবী সারিপুত্র, মৌদগল্যান প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পিতৃদান করছিলেন। স্বামী ও পুত্রদের মৃত্যু সংবাদ সম্বলিত পত্র পেয়েও তিনি ঐর্ষ সহকারে পুণ্যকাজ সম্পন্ন করলেন। সারিপুত্র স্বর্গের এ প্রসঙ্গে উপদেশ দিলেন –

‘কার কখন, কীভাবে মৃত্যু হয় কেউ বলতে পারে না। জীবন ক্ষণস্থায়ী ও দুঃখপূর্ণ। জরা, ব্যাধি একদিন সবাইকে গ্রাস করবে। মৃত্যুই প্রাণিজগতের স্বভাবধর্ম। জন্ম মৃত্যুর কারণ না জেনে শোক করা বৃথা। শোকাত ব্যক্তি কৃশ ও বিবর্ণ হয়। এতে মৃত ব্যক্তির কোনো লাভ হয় না। পুণ্য কর্মই মৃতব্যক্তির উপকারে আসে।’

দানকার্য শেষে মল্লিকাদেবী নিজ শোকাত পুত্রবৃন্দের ডেকে বললেন, ‘তোমরা নিরাপরাধ। তোমাদের স্বামীগণ পূর্বকর্মের ফল ভোগ করেছে। শোক কর না। রাজার প্রতিও বিদ্বেষভাব পোষণ করা না।’

রাজা এ সংবাদ চব্বের মুখে শুনে মল্লিকার নিকট এসে ক্ষমা চাইলেন। পুত্রবধূর স্ব স্ব পিতৃকালয়ে চলে গেল। মল্লিকাদেবীও আপন পিতৃকালয়ে আজীবন ত্রিরত্নের সেবার নিয়োজিত ছিলেন। বৃন্দ পরিনির্বাপিত হলে তার সপ্ততরুখচিত ‘মহালতা প্রসাধন’ দান করে ধাতুচেতা নির্মাণ করেন। তিনি যথাকালে দেহত্যাগ করে দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর ঐশ্বর্য, সহনশীলতা এবং ক্ষমাশীলতা অনুকরণীয়।

### অনুশীলনমূলক কাজ

মল্লিকাদেবী কার স্বামী ছিলেন?

মল্লিকাদেবী শোকাত পুত্রবধূদের কী উপদেশ দিয়েছিলেন?

### পাঠ : ৫

### বৃন্দমোঘ

বৃন্দমোঘ ছিলেন বিখ্যাত পলি অট্টকথা রচয়িতা। অট্টকথা শব্দের অর্থ অর্ধকথা বা ভাষ্য। বৃন্দমোঘ খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বৃন্দমোহসুপ্তি, হুদুবংসে প্রকৃতি গ্রন্থে তিনি বৃন্দগয়ার নিকটবর্তী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানকালের পণ্ডিতগণ মনে করেন, তিনি দক্ষিণ ভারতের অঙ্গ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। তিনি খুবই মেধাবী ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি ত্রিবেদে গারদশীতা অর্জন করেন। তিনি বিতর্ক করে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে বেড়াতেন। তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও যুক্তির কাছে সকলেই পরাজিত হতেন। এমনি করে বিতর্ক করে বেড়ানোর সময় তিনি এক বিহারে এসে উপস্থিত হন। সেই বিহারে তিনি প্রবর্ত ঝের নিকট অভিমর্মের ব্যাখ্যা শুনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর কণ্ঠ বৃন্দের মতো গম্ভীর, তাঁর দেশনা বৃন্দের মতো হৃদয়গ্রাহী এবং সর্বশাস্ত্রী হওয়ার দীক্ষার পর তিনি বৃন্দমোঘ নামে খ্যাত হন।

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ত্রিপিটকে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর, তিনি এগানোদয় (জ্ঞানোদয়) এবং ধর্মগজানীর অট্টকথা অথসাগিনী রচনা করেন। তারপর তিনি পরিতট্টকথা গ্রন্থটি রচনা আরম্ভ করেন। গুরু তাঁর পণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হন। সে সময় ভারতে অট্টকথা ছিল না বলে গুরু তাঁকে সিংহলে গিয়ে সিংহলি ভাষায় সংরক্ষিত অট্টকথাসমূহ পলি ভাষায় রচনা করার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। গুরুর নির্দেশে তিনি সিংহলের অনুরাধাপুর মহাবিহারে গমন করেন। তখন সিংহলের রাজা ছিলেন মহানাম। সেখানে তিনি মহাবিহারের সন্ন্যাসস্থান সন্ন্যাসাল ঝের নিকট ঝেরবাদ ও অট্টকথা আয়রন করেন। শিফাফাংগের পর তিনি পলি ভাষায় অট্টকথা রচনার উদ্দেশ্যে মহাবিহারে সংরক্ষিত গ্রন্থসমূহ প্রদানের জন্য সন্ন্যাসাল ঝেরকে অনুরোধ করেন। তখন মহাবিহারের ভিক্ষুসম্ম তাকে দুটি গাথা প্রদান করেন এবং গাথাধ্ব্য ত্রিপিটকের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে তাঁর যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য আদেশ করেন। গাথাধ্ব্যের ব্যাখ্যাকল্প তিনি বিখ্যাত বিসুন্ধিমার্গ বা বিসুন্ধিমার্গ গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটিকে ত্রিপিটকের সারসংকলন বলা হয়। এ গ্রন্থটি রচনা করে তিনি প্রকৃত যশ খ্যাতি অর্জন করেন। কথিত আছে যে, দেবতারা তাঁর যশ খ্যাতি প্রচারের জন্য

গ্রন্থটি লুকিয়ে রাখেন। তখন তিনি পুনরায় আর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। দ্বিতীয়বারও দেবতারা গ্রন্থটি লুকিয়ে রাখেন। তিনি পুনরায় তৃতীয়বার গ্রন্থটি রচনা করে যখন সংঘের নিকট সমর্পণ করতে বাচ্ছিলেন তখন দেবতাপুত্র অপর দু'টি গ্রন্থও যথাস্থানে রেখে যান। ভিক্ষুগণ তিনটি গ্রন্থ পাঠ করতে আরম্ভ করেন এবং দেখেন যে তিনটি গ্রন্থই ছুবুত্র এক। তখন মহাবিহারের ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে 'মৈত্রীয়া বোধিসত্ত্ব' উপাধিতে ভূষিত করেন।

সিংহলের ভিক্ষুসম্মত তাঁর পণ্ডিত্য ও লেখার দক্ষতা দেখে 'অট্টকথা' অনুবাদ করার অনুমতি দেন। অতঃপর তিনি অনুরাধপুরার মহাবিহারের গ্রন্থাগারে প্রবেশ করে অট্টকথা রচনা করতে থাকেন। তিনি ষোলটি গ্রন্থ রচনা করেন বলে জানা যায়। গ্রন্থগুলো হলো :

১। এয়ানাদয় (জ্ঞানোদয়) ২। অধসালিনী ৩। পরিভট্টকথা ৪। বিসুন্ধিমগ্গ (বিশুন্ধিমার্গ) ৫। সমন্তপাসাদিকা ৬। কজ্জাবিতরণী ৭। সুমঙ্গলবিলাসিনী ৮। পপ্পম্বসুদনী ৯। সারথপকাসিনী ১০। মনোরথপুঙ্গবী ১১। সম্যোহবিনোদনী ১২। পঙ্কপকরণাট্টকথা ১৩। পরমথজ্ঞেয়িকতা ১৪। ধম্মপদট্টকথা ১৫। জাতকট্টকথা এবং ১৬। বিসুন্ধরজনবিলাসিনী।

দীর্ঘ পরিশ্রমের পর বুদ্ধোষ সিংহলি অট্টকথা পালি ভাষায় অনুবাদ করে ভারতে ফিরে আসেন। এভাবে মহাপণ্ডিত বুদ্ধোষ অট্টকথা রচনা করে বৌদ্ধ সাহিত্যকে যেমন সমৃদ্ধ করেছেন, তেমনি বৌদ্ধধর্ম দর্শনকেও সহস্রতর করে তুলেছেন। কালজয়ী গ্রন্থ রচনা করে বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন।

### অনুশীলনমূলক কাজ

অট্টকথা শব্দের অর্থ কী?

বুদ্ধোষ নামের বিশেষত্ব লেখ।

বুদ্ধোষের গ্রন্থগুলোর একটি তালিকা তৈরি কর।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। অহিংসক কোথায় বিন্যাসিকা লাভ করেন ?

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| ক) বিক্রমশীলায় | খ) অনুরধাপুরে |
| গ) নালন্দায়    | ঘ) তক্ষশীলায় |

২। পুণ্ডরীক মল্লিকাদেবীর জীবনী থেকে শিক্ষণীয় দিক –

- ত্রিপুরের সেবার নিয়োজিত থাকা
- ক্ষমশীলতা অনুকরণ করা
- বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |            |                |
|------------|----------------|
| ক) i ও ii  | খ) ii ও iii    |
| গ) i ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

পুণ্ডরীকী বহুদা বড়দা পরিণত বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি প্রতিদিন সকালে বিহারের ভিক্ষুদেরকে প্রাতঃরাশ দান করতেন এবং সেবা শ্রুতায় জন্য নিজেকে আত্মনিয়োগ করতেন। একদিন ভিক্ষুদের একত্রিটিতে দান দেয়ার সময় পরিবারের দুঃসংবাদ শুনেও নিজ কর্তব্য সম্পাদন করেন।

৩। অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনাটির সাথে কোন খেীর ইঙ্গিত বহন করে ?

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| ক. মল্লিকাদেবীর | খ. মহাপ্রজাপতি গৌতমীর |
| গ. কেমার        | ঘ. উৎপলবর্ণার         |

৪। উক্ত খেীর কর্ম অনুসরণের মাধ্যমে পরকালে পুণ্ডরীকী স্বরূপ বড়দা কী লাভ করতে পারেন ?

- |              |              |
|--------------|--------------|
| ক. স্বর্গলোক | খ. দেবলোক    |
| গ. ব্রহ্মলোক | ঘ. মনুষ্যলোক |

### সৃজনশীল প্রশ্ন :

১। বহুদা চাকমা গোশায় সেবিকা। তাঁর এক আত্মীয়ের দুর্ঘটনার কারণে তাঁর এক নবজাত পুত্র সন্তানের লালন পালনের দায়িত্ব নেন। পুত্র বড় হলে জগতের আলোকপ্রাপ্ত মহাজানী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রুতিধর স্বর্গবিরের নিকট বহুদা চাকমা প্রণয়ী ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা গোষণ করলেন এবং তা বাস্তব সূচাবরূপে সম্পন্ন করেন।



ক. সৌতম বুৎসের পূর্বকর্তা বুৎসের নাম কী ছিল ?

খ. চরিতমালার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. বনুনা চাকমার ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মহাথেরীর জীবনী ও গুণাবলি প্রতিফলিত হয়েছে—ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত মহাথেরীর অর্হতফল বনুনা চাকমার ক্ষেত্রে কতটুকু প্রতিফলন ঘটতে পারে ? মূল্যায়ন কর।

২। ঘটনা-১ : সপ্তদর্শী বড়ুয়া শিক্ষকের সন্তান হলেও তার ধ্যান-ধারণা অতি অসাধারণ ছিল। সংসারের প্রতি তার কোনো টান ছিল না। তাই প্রব্রজ্যা নীক্ষা নিয়ে সহজে ভিক্ষুত্ব পরিণত হলেন। তিনি বুৎসের নির্দেশিত অভিধর্মের ব্যাখ্যা গভীর তপস্যার মাধ্যমে সুরেলা কণ্ঠে আবৃত্তি ও দেশনা করতে পারতেন।

ঘটনা-২ : সুজন এবং তার দাদু কমলাপুর বিহারে বেড়াতে গেলেন। সেখানে বুৎসের ছবির পাশে দণ্ডায়মান আর এক ছবি দেখে সুজন তার দাদুর কাছে তা জানতে দাদু বললেন, চাইলেন ইনি কে? ইনি পূর্বে ক্রোধ ও হিংসাপরায়ণ ছিলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ইনি হিংসা ক্রোধ ত্যাগ করে অহিংসক নামে খ্যাতি অর্জন করেন।

ক. পুণ্যবতী মন্দির কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

খ. মল্লিকাদেবীকে তার স্বামী পিত্রালয়ে যেতে আদেশ দিলেন কেন ? ব্যাখ্যা কর।

গ. ঘটনা-১ চরিতমালার কোন পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ঘটনা-২ এ অঞ্জুলিমালের কাহিনীর প্রতিফলন তা পাঠ্যপুস্তক কোথাকোকে বিশ্লেষণ কর।

**শূন্যস্থান পূরণ কর :**

১. . . . সন্ন্যাসীরা এক যুদ্ধ শিষ্যের নাম।

২. শয়ন কক্ষে রাজার . . . হতে জ্যোতি বের হলো।

৩. অহিংসককে বিন্যাশিকর জন্য . . . পর্যাণো হলো।

৪. শাকা ও কোলিয়দের মধ্যে . . . জল নিয়ে বিবাদ হয়েছিল।

৫. পুণ্যশীলা মল্লিকাদেবী . . . জন্মগ্রহণ করেন।

৬. বুৎসদোষ . . . শতকে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

## মিলকরণ :

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর

| বাম                         | ডান                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| ক. রাজা সন্তুষ্ট হয়ে       | ত্যাগ করে ধ্যান করতে শুরু করি        |
| খ. দুপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্বপ্ন  | সকল শায়ে কুড়িভুর পরিচয় দেয়       |
| গ. অল্প সময়ের মধ্যে অহিংসক | অনুভবকে এক হাজার মুদ্রা প্রদান করলেন |
| ঘ. অহিংসক গুরুর আদেশ        | হিংসা করি না                         |
| ঙ. আমি আর কাউকে             | শিরোধার্য করে নিল                    |

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বিনালায়ে কেন অহিংসকের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল?
২. অহিংসকের নরহত্যা করার কারণ কী?
৩. বুন্দ্ব কী কারণে বৈশালী থেকে কদিলাক্ষ্ম গিয়েছিলেন।
৪. স্বামী ও গুরুদেবের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মল্লিকাদেবী কী করেছিলেন?
৫. বুন্দ্বমোখ কেন সিংহলে গিয়েছিলেন?

## রচনামূলক প্রশ্ন :

১. অনুবৃন্দ খের কীভাবে জন্ম-জন্মান্তরের প্রচেষ্টায় উন্নত জীবন লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন বর্ণনা কর।
২. ‘আজই আমার অহিংসক নাম সত্যে পরিণত হয়েছে’, এই বক্তব্যটি কে এবং কেন বলেছিলেন লেখ।
৩. মহাত্মাজাতি গৌতমীর ভিক্ষুণী হওয়ার বিবরণ নিজের ভাষায় লেখ।
৪. সারিপুত্র স্ববির মল্লিকাদেবীকে কোন বিষয়ে কী উপদেশ দিয়েছিলেন লেখ।
৫. বুন্দ্বমোখ কীভাবে বৌদ্ধ সাহিত্যের উন্নতি সাধন করেছিলেন লেখ।

## নবম অধ্যায়

### জাতক

জাতক ত্রিপিটকের অন্তর্গত বুদ্ধক নিকায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এ গ্রন্থে সৌতম বুদ্ধের অতীত জীবনের নানা কাহিনী ও ঘটনা বর্ণিত আছে। বুদ্ধ তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য ও অনুসারীদের প্রসঙ্গক্রমে এসব কাহিনী ও ঘটনা বর্ণনা করতেন। এসব কাহিনী মনুষ্যকে নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। তাছাড়া এসব কাহিনীতে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের নানারকম তথ্য পাওয়া যায়। ফলে জাতক কাহিনীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও সামাজিক প্রভাব অশ্রুতিসীম। এ অধ্যায়ে আমরা জাতকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব, সামাজিক প্রভাব এবং গুরু জাতক, ভদ্রকট জাতক, শিবি জাতক, বনুপথ জাতক, ন্যাগ্রোথমুগ জাতক সম্পর্কে পড়ব।

#### এ অধ্যায় শেষে আমরা -

- \* জাতকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব
- \* জাতক পাঠের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা ও সমাধানের উপায়সমূহ চিহ্নিত করতে পারব
- \* জাতক পাঠ করে তৎকালীন ভৌগোলিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয় বারংবার করতে পারব
- \* জাতক কাহিনী বলতে পারব।

### পাঠ : ১

#### জাতকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

পূর্বের শ্রেণিতে আমরা জাতক কী তা পড়েছি। এখন আমরা জাতকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব পড়ব। জাতকে প্রাচীন ভারতের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয়ে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। তাই জাতকে প্রাচীন ইতিহাসের অন্য উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়।

জাতক পাঠে প্রাচীনকালের রীতিনীতি ও আচরণ-ব্যবহার সম্পর্কে জানা যায়। জাতক পাঠে জানা যায় যে, তখনকার সমাজে চার প্রকার বর্ণ প্রথা প্রচলিত ছিল। যথা : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। ব্রাহ্মণরা যাজক বা পুরোহিত ছিলেন। সমাজে তাঁদের অনেক প্রতিপত্তি ছিল। ক্ষত্রিয়রা রাজ্য শাসন করতেন। বৈশ্যরা ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। শূদ্ররা ছিলেন শ্রমজীবী। সমাজে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। জাতকে চন্ডাল নামক নিম্নবর্ণের ব্যক্তিগণ উল্লেখ পাওয়া যায়। চন্ডালরা শ্মশানে, বুদ্ধের নিচে বা বনাঞ্চলে বসবাস করত। পল্লি অঞ্চলের সধারণ মানুষ কৃষি ও পশু পালন করে জীবিকা নির্বাহ করত। নগরে প্রাসাদ, প্রমোদ-উদ্যান, মন্দির, ক্রীড়াভবন ও নৃত্যশালা ছিল। প্রাসাদগুলো ছিল কার্টের তৈরি। ধনী ও রাজ্যনা শ্রেণির লোকের আমোদ-প্রমোদের মধ্যে ছিল শিকার, অস্ত্র চালনা, নৃত্য-গীত ইত্যাদি। রাজকন্যা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের কন্যারা খেলাধুলা ভালোবাসতেন। খেলায় পণ রাখার রীতি ছিল এবং পণে হেরে গিয়ে অনেকে সর্বস্বান্ত হতেন। উৎসবের সময় নাচ, গান হতো।

সাপুড়েরা সাপ ও বানর নিয়ে খেলা দেখাত। বিবাহে পণ প্রথা প্রচলিত ছিল। বৃশ্চ পণ প্রথার নিদা করেন। তখন বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। জনসাধারণের প্রধান আহার ছিল ভাত, যাপু, মাছ, মাংস ইত্যাদি। উৎসবের সময় পায়ের ও পিঠা তৈরি করা হতো। ঋষ ও গ্রৌপ্য অলঙ্কারের প্রচলন ছিল।

জাতকে অধীনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। জাতক পাঠে সমুদ্র বাণিজ্যের কথা জানা যায়। বিভিন্ন রকম পণ্য নিয়ে বাণিকেরা অর্ধবর্ষোত্তর সাহায্যে সমুদ্র পাড়ি দিতেন। বিভিন্ন স্থানে নোজর করে পণ্যের বিনিময়ে ঋষ-রৌপ্য-প্রবাল নিয়ে ফিরে আসতেন। রাজারা প্রজাদের নিকট হতে কর সংগ্রহ করতেন। প্রজারা শস্যের একটি অংশ কর হিসেবে প্রদান করত। মুদ্রা ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। তবে পণ্যের বিনিময়ে পণ্য দেয়ার প্রথাও ছিল।

জাতক পাঠে রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানা লাভ করা যায়। জাতক পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীন ভারত যোলটি জনপদ বা রাষ্ট্রের বিভক্ত ছিল। বৃশ্চের সময়কালে মগধ, কোশল, বজ্জি, মল্ল প্রভৃতি শক্তিশালী রাজ্য ছিল এবং বৈশালী, চম্পা, শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, বরাণসী প্রভৃতি ছিল সমৃদ্ধশালী নগর। বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে রাজন্যবর্গ ও শ্রেষ্ঠীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে রাজা বিম্বিসার, রাজা অজাতশত্রু, রাজা প্রসেনজিত, শ্রেষ্ঠী আন্যপিত্তিক প্রমুখ ছিলেন অন্যতম। ভগবান বৃশ্চ ‘মহাবর্মপাল’ জাতক শুনিয়ে তাঁর পিতা রাজা শূশ্বেদনকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। তিনি স্কন্দম, লটুকিক, বৃদ্ধধর্ম, দম্ভ ও সম্বোধমান এই পঞ্চজাতক শুনিয়ে শাক্য ও কোলিদের দীর্ঘদিনের বিরোধের অবসান ঘটিয়েছিলেন। শাসন ব্যবস্থা ছিল রাজতন্ত্র। রাজার হাতে ছিল শাসন ক্ষমতা। কিন্তু রাজা অত্যাচারী হলে প্রজারা বিদ্রোহ করত। অনেক সময় প্রজারা রাজা নির্বাচন করতো।

জাতকে ধর্ম, শিক্ষা ও শিল্প সম্পর্কেও তথ্য পাওয়া যায়। জাতক পাঠে জানা যায় যে, জনগণ ধর্ম হিসেবে পূজা, যাগযজ্ঞ, তন্ত্র-মন্ত্র এবং বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন করতো। পশুবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। পুরুষে শিক্ষা দেয়া হতো। গুরু মেধা অনুসারে শিক্ষার্থীকে নানা প্রকার শাস্ত্র ও শিল্প শিক্ষা দিতেন। জাতক পাঠে নারী শিক্ষার কথাও জানা যায়। দেশের রাজা ও ধনী ব্যক্তির পুত্রকে নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

উপরে বর্ণিত বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, জাতক প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ধারক ও বাহক। তাই পুরাতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকগণ জাতকে প্রাচীন জনজীবনের জীবন্ত ইতিহাস হিসেবে অভিহিত করেছেন।

### অনুশীলনমূলক কাজ

জাতককে কেন প্রাচীন জনজীবনের জীবন্ত ইতিহাস বলা হয়?

## পাঠ : ২

## জাতকের সামাজিক প্রভাব

জাতকের অনেক সামাজিক প্রভাব রয়েছে। জাতকের সমস্ত কথাই উপদেশমূলক এবং মহাপুরুষের বাক্য। জাতকে কঠিন ধর্মতত্ত্বসমূহ কাহিনীর মাধ্যমে সহজ সরলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এজন্য নৈতিক জীবন গঠন ও ধর্মতত্ত্ব বোঝার জন্য জাতকের পুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। জাতকে প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। জাতক পাঠে জানা যায় যে, বুদ্ধের সময়কালে ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণপ্রথা প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এ চারটি ভাগে সমাজ জীবন বিভক্ত ছিল। ব্রাহ্মণরা ছিলেন পুরোহিত বা যাজক শ্রেণির। সমাজে তাঁদের পূর্ব প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। ক্ষত্রিয়রা ছিলেন যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। তারা রাজ্য শাসন করতেন। বৈশ্যরা ব্যবসা বাণিজ্য এবং শুল্ক প্রমজীবি ছিলেন। বুদ্ধ ছিলেন জাতিভেদ প্রচার বিরোধী। তিনি জন্ম নয়, কর্ম দ্বারাই মানুষের পরিচয় নির্ধারণ করেছেন। জাতক জাতিভেদ ও বর্ণ বৈষম্য পরিহার করতে শিক্ষা দেয়। জাতকের কাহিনীগুলো নৈতিক উপদেশে সমৃদ্ধ। যেমন : গোতে পাপ পাশে মৃত্যু; তাগ ও দানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম; চটিকারিতার ফল কখনো ভালো হয় না; শীলবান ব্যক্তি সর্বত্র পুজিত ও প্রশংসিত হয় ইত্যাদি। এসব নীতিকথা মানুষকে ঐনিতিক কর্ম পরিহার করে কুশলকর্ম সম্পাদনে উত্থাপন করে। সাহিত্য সমাজের দর্পন। সমাজ বিনির্মাণে সাহিত্যের প্রভাব অপরিসীম। জাতকের কাহিনীগুলোতে গল্প ও উপন্যাস রচনার প্রচুর উপকরণ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণ জাতক থেকে পটখুমি গ্রহণ করে রাজা, শাপমোচন, অরুণরতন এ তিনটি নাটক রচনা করেন। জাতকের কাহিনী সমাজের অগম্যস্তম্য বিষয়সমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো দূরীভূত করার উপায় শিক্ষা দেয়। জাতক পাঠে সর্বজীবের প্রতি প্রীতি জন্মে। দানশীলতা, দয়াশীলতা, সহনশীলতা, ক্ষমা ও পরোপকারী মনোভাব সৃষ্টি হয়। এসব গুণাবলি আমাদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। সমাজে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত থাকে। কুসংস্কার ত্যাগ করে সত্য ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করতে জাতক শিক্ষা দেয়। অতএব, বলা যায়, সমাজ জীবনে জাতকের প্রভাব অপরিসীম।

## অনুশীলনমূলক কাজ

জাতকের উপদেশের একটি তালিকা তৈরি কর

## পাঠ : ৩

## গুপ্ত জাতক

পুরাকালে বারানসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের সময়ে বেহিসত্ত গুপ্ত বা শকুন হয়ে জন্মেছিলেন। বড় হওয়ার পর তিনি বুড়ো মা-বাবাকে সেবাশীনা করতেন। এক পর্বতের উপর শকুনদের নির্জন গুহায় তাঁরা থাকতেন। বেহিসত্তবৃত্তী গুপ্ত বারানসীর শূশান থেকে মৃত গরুর মাংস এনে মা ও বাবাকে ঝাওয়াতেন। সেই শূশানে এক ব্যাঘ মাঝে মাঝে শকুন দ্বারা জন্য ফাঁদ পেতে রাখত। একদিন গুপ্ত সেখানে মৃত গরুর মাংস ঝুঁজতে গেলেন। শূশানে ঢুকতেই তিনি ফাঁদে আটকে পড়লেন। তখন তিনি ভাবলেন, আমি ফাঁদে আটকে গেলাম এজন্য আমার চিত্তা নেই, কিন্তু আমার বুড়ো মা-বাবাকে কে ঝাওয়াবে? কেমন করে তাঁরা জীবন বাঁচাবে? যেতে না পেলে তাঁরা পর্বতের পুহায় মরা যাবে।

একুশ চিন্তা করার পর বিলাপ করতে করতে তিনি বললেন, “নিষ্ঠুর ব্যাবের ফাঁদে আমি আটকে পড়েছি। আমার আর উদ্ধার পাওয়ার আশা নেই। কিন্তু আমার বুড়ো মা-বাবার কী হবে? তাঁদের দুর্দশা কে খোঁচাবে?”

গুপ্তের এই বিলাপ শুনে ব্যাধ উত্তরে বলল, “কী দূরত্ব তোমার, কিসের দুর্দশা? পাখি হয়েও মানুষের ভাষায় এভাবে কথা বলতে আমি কান্টিকে দেখিনি। এ যে ভারি অদ্ভুত ব্যাপার!”

গুপ্ত পুনরায় তাঁকে বললেন,

“আমার মা-বাবা খুব বৃদ্ধ। আমি তাঁদের ভরপ-সংরক্ষণ করি। কিন্তু এখন আমি তোমার ফাঁদে বন্দি। কে এখন তাঁদের দেখাশোনা করবে?”

ব্যাধ পুনরায় উত্তরে বলল,

“শকুনরা আকাশের অনেক উপর থেকেও মরা প্রাণী দেখতে পায়। কিন্তু তুমি কেন তা দেখতে পোলে না? কী তার কারণ?”

গুপ্ত পুনরায় উত্তর দিলেন,

“আজ শেষ হলো জীবগণ কাছের জিনিসও দেখতে পায় না। আমিও সে কারণে এই ফাঁদ দেখতে পাইনি।”



ব্যাধের ফাঁদে আটক গুপ্ত

তখন ব্যাধ তাঁকে বলল,

“তুমি নিজের জন্য না ভেবে বুড়ো মা-বাবার কথা ভাবছ দেখে আমি মূগ্ধ। সেজন্য তোমাকে আমি ফাঁদ থেকে মুক্তি দিলাম। তুমি নির্ভয়ে চলে যাও, মা-বাবার সেবা করো।”

গুপ্ত ব্যাধের সহস্রদয় কথা শুনে তাকে বললেন, “তুমি ব্যাধ হয়েও দয়ালব। এজন্য তোমার মজ্ঞাল হোক। আত্মীয়দের সঙ্গে তুমিও সুখী হবে। আমি আমার বুড়ো মা-বাবার কাছে চলে যাব।

বোধিসত্ত্বগুপ্ত গুপ্ত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ব্যাধকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর শূন্য হাতে ঘুরে ঘুরে আসে নিয়ে মা-বাবার কাছে চলে গেলেন।

**উপদেশ :** মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সত্যবাদীরা চরম বিপদ থেকে রক্ষা পান।

### অনুশীলনমূলক কাজ

গুপ্ত কাদের কথা চিন্তা করছিলেন?

ব্যাধ কেন গুপ্তকে মুক্ত করে দিল?

## পাঠ : ৪

### ভদ্রঘট জাতক

পুরাকালে বারাগঙ্গীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব এক শ্রেষ্ঠীকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বৃন্দ পিতার মৃত্যুর পর তিনি শ্রেষ্ঠীপদ গ্রাস্ত হন। তাঁর শ্রেষ্ঠীপদ গ্রাস্তির সময়ে গৃহে চল্লিশ কোটি ধন ভূগর্ভে নিহিত ছিল।

অনেক দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে শ্রেষ্ঠীকুলী বোধিসত্ত্ব মৃত্যুবরণ করেন এবং মৃত্যুর পর দেবকুলে জন্মগ্রহণ করে দেবতাদের রাজা হন। সেই শ্রেষ্ঠীর ছিল একটি মাত্র পুত্র। সে ছিল খুবই উজ্জ্বল। পিতার মৃত্যুর পর সে রাজপুত্রের উপর এক মণ্ডপ নির্মাণ করল। সেখানে বন্ধু-বান্ধব পরিবৃত্ত হয়ে সে সুরাপানে মত্ত থাকত। প্রমত্ত অবস্থায় সে সহস্র যুগ্মা বিলিয়ে দিত। কেবল নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি ভোগ-বিলাসে সে নিমগ্ন থাকত। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চল্লিশ কোটি ধন ও অসংখ্য সম্পত্তি নিঃশেষ করল। একদিন নিঃস্ব অবস্থায় শতছিন্ন বস্ত্র পরিধান করে বিচরণ করতে লাগল। দেবকুলে দেবতাদের রাজারূপী শ্রেষ্ঠী তাঁর পুত্রের দুর্দশার কথা জানতে পারলেন। একদিন পুত্রস্নেহবশত তিনি পুত্রের নিকট উপস্থিত হন। তিনি পুত্রকে একটি ঘট প্রদান করে বললেন, “বৎস ! এই ঘটটিকে সাবধানে রাখবে, যাতে ভেঙে না যায়। এটা যতদিন তোমার কাছে অক্ষত থাকবে, ততদিন তোমার ধনের অভাব হবে না। এটির রক্ষণাবেক্ষণে ফল কোনো দ্রুতি না হয়।” তিনি পুত্রকে এই উপদেশ প্রদান করে পুনরায় দেবলোক ফিরে গেলেন।

পুত্র ঘটির নিকট যা চাইত তাই পেত। ঘট প্রাপ্তির পর পুত্রটি পুনরায় ধনী হয়ে গেল। সে আবার আগের মতো দিব্যদ্রব্য মদ্য পানে রত হলে। সুবিধাভোগী বন্ধু-বান্ধবরা আবার তাকে ঘিরে ধরল। অবশেষে একদিন উত্তর অবস্থায় সে ঘটটিকে বাঁধবার উর্ধ্বে ঝুড়ে দিয়ে থরতে লাগল। এরূপ করার সময় একবার সে আর ঘটটি ধরতে পারল না। সেটি মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল।



শ্রেষ্ঠীপুর উন্নত অকথায় ঘট উপরে ছুড়ে মারছে

তখন সে ঘাটের নিকট যা চাইত তা আর পেল না। সে পূর্ববার হতদরিদ্র হয়ে পড়ল। শতজিন্দু বহু পরিধানপূর্বক ভগ্ন মূল্যবস্ত্র হাতে ভিক্ষা করতে লাগল। শেষে একদিন এক ব্যক্তির দেয়ালের পাশে অনাহারে অনিশ্রায় প্রাণত্যাগ করল।

**উপদেশ :** উজ্জ্বল জীবনের পরিণাম জন্মাবহ।

**অনুশীলনমূলক কাজ**

বেশিসত্ত্ব মৃত্যুর পর কেথায় গেলেন?

উজ্জ্বল জীবনের পরিণতি বর্ণনা কর (দর্শনীয় কাজ)।



## পাঠ : ৫

## শিবি জাতক

প্রাচীনকালে শিবি রাজ্যের অরিস্টপূর নগরে মহারাজ শিবি রাজত্ব করতেন। বোধিসত্ত্ব তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁর নাম রাখা হয়েছিল শিবিকুমার। তিনি বাল্যকালে তক্ষশীলায় গিয়ে বিবিধশাস্ত্র শিক্ষা করেন। সেখান থেকে রাজধানী অরিস্টপূর নগরে ফিরে এলে তাঁর পাতিভেতার কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পিতা তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে উপযুক্ত পদে নিয়োগ দান করলেন।

কালক্রমে শিবি মহারাজের মৃত্যু হলো। শিবিকুমার রাজ্যের রাজা হয়ে ষাণ্মথ রাজত্ব করতে লাগলেন। তিনি দশবিধ রাজধর্ম প্রতিপালন করতেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধাবৎসল ছিলেন। রাজধানীর ছয়টি স্থানে দানশালা নির্মাণ করে দৈনিক অনেক মুদ্রা ব্যয় করে মহাদান দিতেন। পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও অষ্টমী তিথিতে নিজে দানশালায় গিয়ে দান বিতরণ দেখাশোনা করতেন।

একদিন পূর্ণিমা তিথিতে তিনি সকালবেলা রাজশালঞ্জে বসে ছিলেন। তখন তাঁর দানকার্যের কথা মনে পড়ল। তিনি দেখলেন, তাঁর বহু দান করার আর বাকি নেই। কিন্তু বাহ্যিক দানে তিনি পরিতুষ্ট নন। তাঁর নিজ দেহের অংশ দান করে আধ্যাত্মিক দান পূর্ণ করার সংকল্প গ্রহণ করলেন। যদি কোনো প্রাণী তাঁর দেহের মাংসখণ্ড চায় তিনি তা দান করবেন। কেউ হৃৎপিণ্ড- চাইলে তাও দেবেন। যদি কেউ গৃহকর্মের জন্য তাঁকে দাস হিসেবে নিতে চায় তাহলে তিনি রাজবেশ ত্যাগ করে দাসত্ব করবেন।

এমনি করে তিনি নানা আধ্যাত্মিক দানের বিষয় চিন্তা করছিলেন। শেষে তিনি চক্ষু দান করার সংকল্প করেন। এতদূর ভাবনা করে রাজা সুগন্ধমুক্তি যোল কলসি জলে স্নান করলেন। রাজ্যভরষে সজ্জিত হলেন। তারপর সুসজ্জিত হস্তীরাজের পিঠে আরোহণ করে দানশালায় দিকে যাত্রা করলেন।

এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর চক্ষুদানের মনোবাসনা জানতে পেরে ভাবতে লাগলেন শিবিরাজ চক্ষুদানে কতটুকু সমর্থ? এটা তো দুস্কর কাজ। জগতে বিরল ঘটনা। দেবরাজ শিবিরাজের দানশারমী পুরঞ্জে যোগ্যতা পরীক্ষা করতে চাইলেন। তাই তিনি অশ্ব ব্রাহ্মণের বেশ ধরে দেবলোক থেকে মর্ত্যলোকে চলে এলেন। রাজার গমন পথে দাঁড়িয়ে শিবিরাজের মঙ্গল কামনা কবে বললেন, মহারাজের জয় হোক। রাজা একথা শুনে হত্তি থেকে নেমে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী বললেন? অশ্ব ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, মহারাজ! আপনার দানশীলতার কীর্তি ক্রিষ্টবনে ঘোষিত হয়েছে। আমি একজন অশ্ব, আপনি চক্ষুদান। আমি অনেক নূরদেশ থেকে কষ্ট করে এসেছি। আমাকে আপনার একটি চক্ষু দান করুন, আমি পৃথিবীর আলো দেখতে চাই।

তা শুনে রাজা ভাবলেন আমার কী পরম লাভ! আমি প্রসাদে বসে চিন্তা করে এবেছি। আজ আমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। যা পূর্বে দান করিনি তা আজ দান করব। আজ আমার অনেক আনন্দ হচ্ছে। যাকের পরিচয় জানতে চেষ্টা রাজা বললেন, হে অশ্ব ব্রাহ্মণ! আমার চক্ষুদান দেখতে আপনাকে এখানে কে পাঠিয়েছেন? মানুষের সবচেয়ে প্রিয় চক্ষু আপনাকে কে দান করবে?

প্রভাতের অশ্ব ব্রাহ্মণ বললেন, যিনি ত্রিলোক শাসন করেন, সেই দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে আসতে বলেছেন। তাঁর স্বামী সুজাতা আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ দান দেখতে চান। রাজন! এবার আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন। আমাকে আপনার একটি চক্ষু দান করুন। রাজা উত্তরে বললেন, হে ব্রাহ্মণ! অচিরেই আপনার আশা পূরণ করা হবে। আপনি একটি চেষ্টা করুন। আমার দুটি চক্ষুই আপনাকে দান করব। জগতবাসী আমার দানের মহিমা দেখুক।

রাজা ভাবলেন, দানশালার সামনে চক্ষুদান করা ঠিক হবে না। পাত্র-মিত্র সবাই আতঙ্কিত হয়ে ছুটে আসবে। এজন্য তিনি ব্রাহ্মণকে রাজ অস্ত্রপুরে নিয়ে গেলেন। রাজবৈদ্য সীবককে ববর দিলেন। রাজাআ পেয়ে সীবক চলে এল। রাজা তাঁকে আদেশ দিলেন, 'প্রথমে আমার একটি চক্ষু সীঁড়ানি দিয়ে তুলে ফেল।' সে কথা অশ্ব ব্রাহ্মণরূপী দেবরাজ শুনছিলেন। তিনি নির্দিষ্ট আসনে বসে আছেন।

এদিকে এ ববর সমস্ত নগরে তড়িৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ল। সবখানে কোলাহল উৎপন্ন হল। রাজার প্রিয়পাত্র, নগরবাসী, অস্ত্রপুরবাসী সবাই সমবেত হলো। সকলের পক্ষ থেকে সেনাপতি রাজাকে চক্ষুদান করতে বারণ করলেন।

রাজভাণ্ডারের মণিমুক্তা, ধন-দৌলত সব দান করে দিল। তবুও আপনার আলো প্রদানী চক্ষু দেবেন না। উপস্থিত জনতাকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে রাজা বললেন, আমি চক্ষু দেব বলে মনস্থির করেছি, কষা দিয়েছি, সংকল্প ভাগ্য কথা উচিত না। আমার চক্ষুদানে অশ্ব ব্রাহ্মণ জগতের আলো দেখবে। আর আমি বোহির আলোতে উজ্জ্বলিত হব। সেনাপতি, অমাত্য সবাই নীরব হয়ে গেলেন।

রাজা সীবককে পুনরায় বললেন, তুমি আমার কল্যাণমিত্র। আমার দান পরমী পুরণে সহায়তা কর। আমার চক্ষু উৎপাটন কর। সীবক তদুত্তরে বললেন, মহারাজ! বিবেচনা করে দেখুন। চক্ষু দান করা বড় কঠিন কাজ। রাজা বললেন, সীবক, আমি আমার সিদ্ধান্তে স্থির। কাশবিলম্ব না করে আমার আদেশ পালন কর।

সীবক রাজাকে সুযোগ দেয়ার জন্য প্রথমে শত্রু ঔষধ প্রয়োগ করলেন না। নানারকম ঔষধ চূর্ণ করে একটি নীলপদ্মের ওপর সেগুলো ছড়িয়ে রাখলেন। ঐ পদ্ম রাজার দক্ষিণ চক্ষুতে কুলিয়ে দিলেন। অমনি চক্ষুর গোদক ঘুরে গেল। সীবক বললেন, মহারাজ, ভেবে দেখুন। আমি এখনো প্রতিকার করতে পারি। রাজা উত্তর দিলেন, না অহি, আমি সংকল্পে অটুট। সর্বজ্ঞতাই আমার চক্ষু।



রাজবৈদ্য শিবিকাজার চক্ষু উৎপাটন করছেন

এভাবে রাজাকে তিনবার অনুরোধ করলেন। শেষে সীবক বাম হাতে রাজার চক্ষুটি ধরে ডান হাতে অস্ত্র প্রয়োগ করে চক্ষুটি রাজার হাতে দিলেন। ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করে রাজা চক্ষুটি ব্রাহ্মণকে দিয়ে বললেন, আমার চক্ষু নিন। এ চক্ষু অপেক্ষা আমার নিকট সর্বজ্ঞতা চক্ষু হাজার গুণে প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ। তিনি মনে মনে পুলকিত হয়ে অনুব্রূণভাবে অপর চক্ষুটিও ব্রাহ্মণকে দান করলেন। অশ্ব ব্রাহ্মণ সেই চক্ষুটিও নিয়ে রাজভবন থেকে সেবলোকে চলে গেলেন।

চক্ষুদানের কিছুদিন পর রাজা রাজপ্রাসাদে বসে ভাবলেন, যে জন অশ্ব তাঁর রাজ্যের কী প্রয়োজন? তিনি অমাত্যদের হাতে রাজ্য সমর্পণ করে উদ্যানে গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে শ্রামণাধর্ম পালনের ইচ্ছা পোষণ করলেন। এ অভিশ্রায়ের কথা জানিয়ে অমাত্যদেরকে ডেকে বললেন, আমার আর রাজত্বের সরকার নেই। আমি এখন অশ্ব। আমাকে সাহায্য করার জন্য একজন লোক দিলেই চলবে। পায়ের উদ্যমেই আমি ধ্যান-সমাধি চর্চা করে অবস্থান করব।

পালঙ্কে বসিয়ে অশ্ব রাজাকে উদ্যানস্থ পুকুর পাড়ে মোয়া হলো। সেখানে উপবেশন করিয়ে অমাত্যরা ফিরে গেলেন। তাঁর সেবা শূন্যর ব্যবস্থা করা হলো। রাজা পালঙ্কে বসে নিজের দানের কথা ভাবতে লাগলেন। অমনি দেবরাজ ইন্দ্রের আসন উত্তপ্ত হলো। তিনি এর কারণ বুঝতে পারলেন এবং ভাবলেন, রাজাকে বর দিয়ে চক্ষু দুটি পূর্বের মতো করে দেব।

এ সংকল্প করে তিনি পুকুরঘাটে গিয়ে শিবিরাজের অনুরে পায়চারি করতে লাগলেন। পায়ের শব্দ শুনে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি দেবরাজ ইন্দ্র। আমি আপনাকে বর দিতে এসেছি। ইচ্ছা করলে বর চাইতে পারেন। শিবিরাজ বললেন, আমার ধন, জন, বল অনেক আছে। কিন্তু তাতে কী ফল? এখন মৃত্যু ছাড়া গতান্তর নেই। তখন দেবরাজ বললেন, শিবিরাজ! আপনি কি কেবল মৃত্যু কামনা করেই মরতে চান, না অশ্ব হয়েছেন বলে মরতে চান? রাজা উত্তর দিলেন, সেবেদু। আমি অশ্ব হয়েছি বলেই মরণ চাই।

তখন দেবরাজ বললেন, হে শিবিরাজ! ইহলোক ও পরলোকে লানফল ভোগ করা যায়। মানুষ পরলোকের সুখ শান্তির আশায় দান করে থাকে। আবার ইহজীবনে তার ফল প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেও দানকার্য সম্পাদন করে থাকে। ঘাচক আপনার একটি চক্ষু চেয়েছিল। আপনি দুটি চক্ষু দিয়েছিলেন। সেই পুণ্যফল স্মরণ করে সত্যক্রিয়া করুন। আপনার আশা অবশ্যই পূর্ণ হবে। এ সত্যের প্রভাবে আবার চক্ষু লাভ হবে।

তা শুনে রাজা বললেন, দেবরাজ। যদি প্রকৃতই আপনি চক্ষু দান করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে উপায় নির্দেশ করবেন না। আমার দানের ফলেই চক্ষু উৎপন্ন হবে। ইন্দ্র বললেন, হে শিবিরাজ! আমি দেবরাজ ইন্দ্র। কাউকে চক্ষু দেবার ক্ষমতা আমার নেই। আপনার নিজের দানই সুফল প্রদান করুক।

শিবিরাজ সত্যক্রিয়া করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম চক্ষুটি উৎপন্ন হলো। তিনি ব্রাহ্মণকে একটির পরিবর্তে দুটি দান করেছিলেন। এ সত্যক্রিয়ার প্রভাবে অপরটিও আবিষ্কৃত হলো। এ দুটি পূর্বের চক্ষু নয়, দিব্যচক্ষুও নয়, সত্যপারমিতা-চক্ষু।

এ রকম বিস্ময়কর ঘটনা শুনে রাজপরিবারবর্গ, পাত্রমিত্র সবাই সমবেত হলেন। উপস্থিত জনতাকে উপলক্ষ করে দেবরাজ ইন্দ্র উপদেশ দিলেন, জোমাদের রাজার পূর্ব চক্ষু দৃষ্টিবন্ধ ছিল। বর্তমানের চক্ষু দূর দূরান্তের পর্বত ভেদ করে সবকিছু অবলোকন করতে পারবে। জোমরা অশ্রমত হয়ে ধর্মপথে জীবন পরিচালিত কর। এই বলে তিনি সেবলোকে প্রস্থান করলেন।

শিবিরাজ পুনরায় চক্ষু লাভ করেছেন - এ সংবাদ অচিরে শিবিরাজে প্রচারিত হলো। তখন রাজাবাসী পুজার সামগ্রী নিয়ে রাজপ্রাসাদের বাহিরে একত্র হলো। তাঁরা মন্দের আকৃতি নিয়ে লোকশ্রেষ্ঠকে শ্রদ্ধা জানালেন। রাজা তাদেরকে দান, শীল, ভাবনা প্রভৃতি পুণ্যব্রতে রত থাকার জন্য উপদেশ দিলেন।

**উপদেশ : ত্যাগ ও দানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।**

### অনুশীলনমূলক কাজ

বাহ্যিক দান কী বল।

আধ্যাত্মিক দান কী লেখ।

শিবিরাজ কীভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের মনোবাসনা পূর্ণ করলেন? বর্ণনা কর।

### পঠ : ৬

### বন্ধু পথ জাতক

পুরাকালে ব্যাঘসী নগরে প্রচন্দত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। সেসময় বোধিসত্ত্ব এক বণিকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্ব বড় হয়ে পাঁচশত গাড়ি নিয়ে নানা জায়গায় বাণিজ্য করতেন।

ব্যবসা উপলক্ষে একবার বোধিসত্ত্ব যাঁচি যোজন বিজ্ঞাত এক মনু অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছেন। সেই মনুহুমির বালি এত মিহি ছিল যে তা হাতের মুঠোয় ধরে রাখা যেত না। আত্মলের ফাঁক দিয়ে সে বালি গলে পড়ে যেত। সূর্য ওঠার পর সেই বালুরাশি জ্বলন্ত কয়লার মতো গরম হয়ে উঠত। তখন সেই মনুহুমির ওপর দিয়ে কারও পক্ষে চলাফেরা করা সম্ভব হতো না। সেই ভীষণ মনুপথ পার হতো রাত্রে, দিনে নিতে হতো বিশ্রাম। ব্যবসায়ীরা সজো জল, তেল, চাল ও লাকড়ি ইত্যাদি রাখত। সূর্য উদয় হলে যাত্রা বন্ধ করে বলদগুলো গাড়ি থেকে খুঁদে দিত। গাড়িগুলো পোল করে সাজিয়ে নিয়ে মাঝখানে সামিয়ানা ঝাটিয়ে নিত। সকাল সকাল রান্নাবান্না করে খেয়ে সামিয়ানার নিচে দিন কাটাত। আবার যখন সূর্য ডুবতে বসত তখন আড়াআড়ি রান্না করে খেয়ে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করত। নাবিকরা যেমন সমুদ্রে চলার সময় নক্ষত্র দেখে দিক নির্ণয় করে, তেমনি মনুহুমিতে চলার সময় পথ প্রদর্শকরা নক্ষত্র দেখে পথ চিনে নিত।

বোধিসত্ত্ব একদিন সেই মনুহুমির উনঝাট যোজন পথ অতিক্রম করে গেলেন। তারপর তিনি ভাবলেন, বাকি একযোজন পথও রাতের মধ্যে পার হয়ে যাবেন। এই ভেবে তিনি সন্ধ্যার পর জল, কাঠ ইত্যাদি অনেক জিনিস দরকার নেই দেখে ফেলে দিতে বললেন। এতে বোকা হালকা হবে এবং মনুহুমি পার হয়ে গেলে সেসব জিনিস সব জায়গায় পাওয়া যাবে। এভাবে তাঁরা চলতে শুরু করলেন। যে গাড়িবানা দলের আগে চলছে তাতে বসা ছিল পথ প্রদর্শক। তিনি নক্ষত্র দেখে পথ চিনিয়ে দিচ্ছিলেন।

দীর্ঘদিন মনুহুমি মধ্য দিয়ে চলতে চলতে পথ প্রদর্শকের ভাঙা হুম হচ্ছিল না। সেই রাত্রে তার চোখ জুড়ে

ঘুম এল। বলদগুলোও আপন খোয়ালে উঠে দিকে চলতে শুরু করল। সারারাত এভাবে সব গাড়ি চলল। ভোর হওয়ার আগে আগে পথ প্রদর্শকের ঘুম ভাঙল। আকাশের দিকে তাকিয়ে সে আড়াআড়ি বলল, গাড়ি যোরাও, গাড়ি যোরাও। সমস্ত গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে সূর্য ওঠার সময় হয়ে গেল। সবাই দেখল আগের সন্ধ্যায় তারা যেখানে থেকে যাত্রা করেছিল ঠিক সেই জায়গাতেই তারা আবার ফিরে এসেছে। তখন সবাই চিত্তিত হয়ে পড়ল। গাড়িতে জল নেই, কাঠ নেই। উপায় কী হবে? উপায় না দেখে তারা বলদগুলো খুলে দিয়ে গাড়ি জড়ো করে সামিয়ানা খাটিয়ে হতাশ হয়ে শূন্যে পড়ল।

বৌদ্ধসত্ত্ব ভাবলেন, আমি চেষ্টা করে উপায় খুঁজে বের না করলে সবাই মারা যাবে। ভোরের সময় ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় একবার চারদিকে ঘুরে দেখি, কোথাও জল পাওয়া যায় কিনা। এই ভেবে চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এক গুচ্ছ ঘাস দেখতে পেলেন। এতে তিনি সুবাসে পারলেন যে ওই জায়গায় নিশ্চয়ই জল আছে। দ্রুতবা সেখানে ঘাস জন্মাতে পারত না। তখন তিনি তাঁর অনুচরদের কোদাল দিয়ে সেখানে খুঁড়তে আদেশ দিলেন। খুঁড়তে খুঁড়তে ষাট হাত নিচে একটা পাথরে কোদালের কোপ পড়ে ঠং করে শব্দ হলো। বৌদ্ধসত্ত্ব নিচে নেমে পড়লেন। তিনি পাথরের ওপর কান পেতে শুনতে পেলেন নিচে জলের শব্দ হচ্ছে। তখন তিনি উপরে উঠে এক চাকরকে বললেন, তুমি নিচে নামো। বড় হাতুড়িটা দিয়ে পাথর ভাঙার চেষ্টা করো। চাকরটি খুব উৎসাহী ও উদ্যমী ছিল। সে খিঁচা না করে প্রচুর আদেশ মতো পাথরের ওপর হাতুড়ির খা দিতে লাগল। অতঃপর পাথর ভেঙে গেল। অমনি ভিতরের জল উপর দিকে ছিটকে বেরিয়ে এল। সবাই মহাখুশিতে হুঁদান করল, জল পান করল।



বৌদ্ধসত্ত্ব মহাখুশিতে পানি খুঁজে পেল

তারপর গাড়িতে বেসব বাড়তি চাকা ও কাঠের সরঞ্জাম ছিল সেগুলো চিরে জ্বালানী কাঠ তৈরি করল। সেই কাঠ নিয়ে আগুন জ্বালল। রান্নাবান্না করল। সবাই খেল। গরুগুলোকে খাইয়ে দিহিয়ে চালা করে তুলল। তারপর কুরোর পাশে একটা পতাকা পুঁতে দিল, যাতে দূর থেকে পতাকাটি দেখে অন্য বণিকরা সহজে কুরোটি চিনতে পারে। রাত নামলে তাঁরা অস্থিমি পড়ি দিলেন। রাতের শেষে গরুবা স্থানে পৌঁছালেন। সেখানে বেচাকেনা করে বেহিসত্রে অনেক লাভ হলো। তারপর দেশে ফিরে এসে সুখে বাস করতে লাগলেন। বেহিসত্রে পরিণত বয়সে পরলোক পমন করে স্বর্গে গেলেন।

**উপদেশ :** বিপদে অধীর না হয়ে উদ্ধারের পথ বোঝা উচিত।

পাঠ : ৭

### ন্যাগ্রোমুগ জাতক

পুরাকালে বারানসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বেহিসত্রে হরিপাল্লু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দেহের বয় ছিল পোনার মতো। শিংগুলো সুশালী, মুখ লাল এবং চোখ দুটো ছিল মনিরত্নের মতো উজ্জ্বল। তিনি ন্যাগ্রোম মুগরাজ নাম ধারণ করে পাঁচশ মুগের দলনেতা হয়ে অরণ্যে বিচরণ করতেন।

রাজা ব্রহ্মদত্ত অত্যন্ত মুগয়াসক্ত ছিলেন। মুগ মাংস না গেলে তাঁর আহার হতো না। তিনি প্রতিদিন বহু প্রজা সঙ্গ নিয়ে মুগ শিকারে যেতেন। প্রজাদের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটায় তারা বড় বিরক্ত হয়ে পড়ল। শেষে একদিন তারা পরামর্শ করে একটি সিম্বান্ত গ্রহণ করল। সিম্বান্ত অনুসারে রাজার উদ্যানে মুগদের আহ্বারের জন্য তৃণ রোপন করল। কুপ, পুস্করবী বনন করে জলের আয়োজন করল। তারপর বন থেকে সকল মুগ তাকিয়ে এনে উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করাল এবং উদ্যানের ছায়া বন্দ্য করে দিল।

এভাবে বহু মুগ সংগ্রহ করে তারা রাজার কাছে গিয়ে বলল, “মহারাজ, আপনি প্রতিদিন মুগহায়ে গিয়ে আমাদের কাজে ব্যাঘাত করছেন। আমরা আপনার উদ্যান মুগপূর্ণ করে রেখেছি। এখন থেকে নিজে নিজে উদ্যানের মুগ বহ করে ভোজন করুন।”

ব্রহ্মদত্ত উদ্যানে গিয়ে দেখলেন, সতাই শত শত মুগ উদ্যানে বিচরণ করছে। সোনালী বরণ ন্যাগ্রোম মুগরাজকে দেখে তিনি বললেন, “তোমাকে অভয় দিলাম। তুমি নিশ্চয় চিণ্ডে বাস কর।”

তারপর কোনো দিন রাজা উদ্যানে গিয়ে নিজে শরবিন্দ্য করে মুগ হত্যা করতেন। কোনো দিন তাঁর পাচক গিয়ে মুগ হত্যা করে নিয়ে এসে রন্ধা করত। এভাবে প্রতিদিন মুগ হত্যা করা হতো। কিন্তু ধনুকের টঙ্কার শব্দ শোনা মাত্র প্রাণ ভয়ে মুগগুলো চারিদিক ছুটিছুটি শূন্য করে দিত। ফলে প্রতিদিনই বহুমুগ শরাহত হয়ে মৃত্যু বরণ করত।

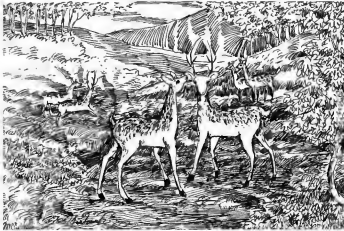
ন্যাগ্রোম মুগরাজ তা দেখে ভাবলেন, নিরর্থক অনেক মুগ নিহত হচ্ছে। এ সমস্যার সমাধান স্বরূপ তিনি সিংহর করলেন, পর্যায়ক্রমে প্রতিদিন একেকটি মুগ রেছায় প্রাণ দেবে।

একদিন এক গর্ভবতী হরিণীর পালা এসে পড়ল। হরিণী নিমুগায় হয়ে ন্যাগ্রোম মুগরাজের কাছে গেল এবং বলল, “প্রভু! আমি গর্ভবতী। এবার আমার পালা। এ সময়ে আমি গেলে একসাথে দুটি প্রাণ বিনষ্ট হবে।

আমায় ছেড়ে দিতে অনুমতি করুন।” ন্যাগোথ মুগরাজ হরিণীকে অভয়া প্রদান করে ছেড়ে দিলেন। হরিণীর পরিবর্তে তিনি নিজে গিয়ে প্রাণ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

যথাসময়ে পাঁচক এসে ন্যাগোথ মুগরাজকে দেখে বিমিত্ত হলো। কারণ রাজা তাকে অভয় দিয়েছিলেন। তিনি ঘটনাটি রাজাকে জানান। রাজা শেনামাত্র পত্রমিত্রসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। তিনি ন্যাগোথ মুগরাজকে সম্বোধন করে বললেন, “সব মুগরাজ! আমি তো তোমায় অভয় দিয়েছিলাম। তবে তুমি কেন আজ নিজের প্রাণ দিতে হাজির হয়েছ?”

ন্যাগোথ মুগরাজ উত্তর দিলেন, “মহারাজ! আজ একটি গর্ভবতী হরিণীর পালা ছিল। সে আমার সাহায্য প্রার্থনা করলে আমি তাকে অভয়া প্রদান করেছি। আমি তার প্রাণ রক্ষার্থে আরেক জনের প্রাণ বিনাশ করতে পারি না। তাই তার পরিবর্তে নিজের প্রাণ দিতে এসেছি।”



অরসে বিচরণরত মুগরাজ

রাজা ন্যাগোথ মুগরাজের কথায় অত্যন্ত প্রীত হয়ে বললেন, “মুগরাজ! আজ আপনি যে মৈত্রী, প্রীতি ও দয়ার পরিচয় দিলেন, তা মানুষের মধ্যেও দেখা যায় না। আমি প্রসন্ন মনে আপনাকে ও সেই গর্ভবতী হরিণীকে অভয় দিলাম।”

মহারাজ! দুটি মাত্র মুগ অভয় পেল, অবশিষ্টদের ভাগ্যে কী হবে?

- আমি অবশিষ্ট মুগদেরও অভয় দিলাম।
- আপনার উদ্যানের সকল মুগ নিঃশঙ্ক হলো, কিন্তু অন্যান্য মুগদের কী হবে?

- আমি তাদেরও অভয় দিলাম।
- মৃগকুল নিষ্ঠুর শেল, কিন্তু অবশিষ্ট চতুষ্পদ প্রাণীদের কী হবে?
- আমি তাদেরকেও অভয় প্রদান করলাম।
- চতুষ্পদ প্রাণী রক্ষা শেল, কিন্তু পাখিদের কী হবে?
- আমি পাখিদেরও অভয় দিলাম।
- পাখিরা অভয় শেল বটে, কিন্তু মৎস্যাদি জলচরদের কী হবে?
- মৎস্যাদি জলচরদেরও অভয় দিলাম।

এভাবে রাজা প্রথমভের কাছ থেকে ন্যায়োপায় মৃগরাজ সকল প্রাণীর জন্য অভয় প্রাপ্ত হলেন। তারপর তিনি রাজ্যকে পঞ্চাঙ্গীল শিক্ষা দিয়ে বললেন, “মহারাজ, ধর্মপথে চলুন, মাতাপিতা, পুত্রকন্যা, গৃহী, সন্ন্যাসী, গৌর জনপদ—সকলের সাথে যথাধর্ম নিরপেক্ষভাবে আচরণ করুন। তাহলে যখন দেহত্যাগ করবেন তখন দেবলোক প্রাপ্ত হবেন।” ন্যায়োপায় মৃগরাজ রাজ্যকে ধর্মোপদেশ প্রদান করে আরো কিছুদিন উদ্যানে বসবাস করে অনুচরগণসহ অরণ্যে ফিরে গেলেন। তারপর থেকে রাজা প্রথমভ আর কোনোদিন মৃগ মাংস ভক্ষণ করেননি।

**উপদেশ : জীবন সকলের নিকট প্রিয়।**

### অনুশীলনমূলক কাজ

বোহিস্কৃত সকল প্রাণীকে কীভাবে রক্ষা করলেন বর্ণনা কর (রাড়ির কাজ)

### অনুশীলনী

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। প্রাচীনকালে ভারবর্ষের সমাজ ব্যবস্থায় কয় প্রকার বর্ণপ্রথা প্রচলিত ছিল ?

- |         |        |
|---------|--------|
| ক) তিন  | খ) চার |
| গ) পাঁচ | ঘ) ছয় |

২। জাতকের কাহিনীতে শিক্ষা পাওয়া যায় –

- i. বর্ণবৈষম্য পরিহার করার
- ii. সমাজের অসামঞ্জস্য বিষয়গুলো দূর করার
- iii. সত্য ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করার



নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii

খ) ii ও iii

গ) i ও iii

ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

ব্রহ্মন চাকমা বন্য প্রাণী শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করেন। অপরদিকে তার ছোট ভাই পরিমল চাকমা পক্ষশীল অনুযায়ী জীবন যাপন করেন। এক পর্যায়ে পরিমল চাকমা তার ভাইকে শেখা পরিহার করে প্রাণীদের প্রতি মৈত্রীপরায়ন হওয়ার জন্য বলেন।

৩। উক্ত ঘটনাটি কোন জাতকের সাথে মিল আছে ?

ক. নারায়ণমুগ জাতক

খ. শিবি জাতক

গ. তদ্রথ্য জাতক

ঘ. গুপ্ত জাতক

৪। উক্ত জাতকের শিক্ষণীয় নিক হচ্ছে –

i. জীবন সকলের কাছে প্রিয়

ii. সকল প্রাণী সুখী হোক

iii. যত্নবর্ধন নিরপেক্ষ আচরণ করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii

খ) ii ও iii

গ) i ও iii

ঘ) i, ii ও iii

সূচনশীল প্রশ্ন :

১। কমল বড়ুয়া সরকারি কর্মচারী ছিলেন। তিনি সংভাবে জীবিকা নির্বাহ বরং শৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা করেন এবং সোনশনের টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন। তিনি মারা যাওয়ার পর তার একমাত্র ছেলে হিমেল বড়ুয়া টাকা তুলে ব্যবসা শুরু করে। এতে ভালো লাভ হলো। কিন্তু কুসন্তীদের চক্রে পড়ে সে বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে সব সম্পত্তি বিনষ্ট করে নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনে।

ক. ‘জীবন সকলের নিকট প্রিয়’ এই উপদেশটি কোন জাতকের ?

খ. শিবিরাজা চন্দ্র দান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন কেন ? বর্ণনা কর।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটিতে কোন জাতকের ইঙ্গিত বহন করে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘উজ্জ্বল জীবনের পরিণাম ভয়াবহ’—জাতকের উপদেশটি হিমেল বড়ুয়ার কার্যকলাপে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে। মতামত দাও।

২। ঘটনা-১ : হৃদয় বুড়ো তার বৃন্দ পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান এবং একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। তিনি প্রতিদিন কর্মস্থলে যাওয়ার সময় মাতা ও পিতাকে প্রণাম করে যান। একদিন অফিসে যাওয়ার সময় বাস দুর্ঘটনায় সবাই আহত হলেও হৃদয়ের শরীরে কোন আঘাত লাগেনি।

ঘটনা-২ : মিলন মুন্সুখী ছেটিবেলা থেকে দয়ালু ও দানবীর ছিলেন। একদিন টিভির বিজ্ঞাপনে একজন গরিব মুন্সুখী রোগীর রক্তের প্রয়োজন বিজ্ঞাপন দেখে হাসপাতালে যান এবং উক্ত রোগীকে রক্ত দান করেন।

ক. জাতক ত্রিপিটকের কোন নিকায়ের অন্তর্গত ?

খ. সৌতম বৃন্দ জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন কেন ? ব্যাখ্যা কর।

গ. ঘটনা-১ এ কোন জাতকের প্রতিফলন ঘটেছে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'তাণ ও দানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম' শিবি জাতকের এই উপদেশটি ঘটনা-২ এর প্রতিফলন - উক্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

#### শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. বণিকেরা অর্ধবপোতের সাহায্যে . . . পাড়ি দিতেন।
২. তখনকার সমাজে . . . বর্ণপ্রথা প্রচলিত ছিল।
৩. বোধিসত্ত্ব মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে . . . বন্যবাদ দিলেন।
৪. শিবিরাজ সভ্যক্রিয়া করার সজ্ঞা সজ্ঞেই . . . চক্ষুটি উৎপন্ন হল।
৫. রাজা ব্রহ্মদত্ত অত্যন্ত . . . ছিলেন।

#### মিলকরণ :

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর

| বাম                        | ডান   |
|----------------------------|---|
| ১. শূদ্ররা ছিলেন           | শাসন ক্ষমতা                                     |
| ২. রাজার হাতে ছিল          | কর হিসেবে প্রদান করতেন                          |
| ৩. প্রজারা শস্যের একটি অংশ | শ্রমজীবী  |
| ৪. প্রাসাদগুলো ছিল         | ধর্ম, শিক্ষা ও শিল্প সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায় |
| ৫. জাতকে                   | কার্ঠের তৈরি                                    |

#### সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. প্রাচীনকালে সমাজ ব্যবস্থায় কত প্রকার বর্ণপ্রথা প্রচলিত ছিল?
২. রবীন্দ্রনাথ কুশ জাতক অবলম্বনে কী কী নাটক রচনা করেন?
৩. গুপ্ত জাতকে ব্যাধ কেন গুপ্তকে মুক্ত করে দিলেন?
৪. ন্যায়প্রোদ্ধমুর্গের কুপ বর্ণনা কর?
৫. কীসের ফলে শিবিরাজার দুটি চক্ষু ফিরে এল?

#### রচনামূলক প্রশ্ন :

১. জাতকের সামাজিক প্রভাব বর্ণনা কর।
২. তদ্রূপে জাতকে উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পরিণাম ব্যাখ্যা কর।

## দশম অধ্যায়

### বৌদ্ধ তীর্থস্থান

পূর্বের শ্রেণিতে আমরা বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে জেনেছি। তীর্থস্থান সকল ধর্মের মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। প্রত্যেক ধর্মের তীর্থস্থান রয়েছে। বৌদ্ধদেরও অনেক তীর্থস্থান আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এসব তীর্থস্থান অবস্থিত। তবে অধিকাংশ তীর্থস্থান রয়েছে ভারতে। তীর্থস্থান দর্শন পুণ্যের কাজ। বৌদ্ধরা পুণ্য অর্জনের জন্য তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন। এ অধ্যায়ে চারি মহাতীর্থস্থান এবং তাদের ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- \* চারি মহাতীর্থস্থানের বর্ণনা দিতে পারব ;
- \* চারি মহাতীর্থস্থানের ধর্মীয়, ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

### চারি মহাতীর্থস্থান পরিচিতি

খ্রীষ্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে গৌতমবুদ্ধ বর্তমান নেপালের লুম্বিনী কাননে জন্মগ্রহণ করেন। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর সর্বপ্রাণীর কল্যাণের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করে তিনি ধর্ম প্রচার করেছেন। গৌতম বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত সেসব স্থান তীর্থস্থানের মর্যাদা লাভ করে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত তীর্থস্থানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো লুম্বিনী, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কুশিনগর, রাজগৃহ, ধাবন্তী, অশ্বিনাবধূ , নালন্দা, বৈশালী, কোশাঘী ইত্যাদি। এসব স্থানে বুদ্ধ অনেক মূল্যবান সময় অতিবাহিত করেছেন। অনেকবার বর্ষাবাস উদযাপন করেছেন। অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছেন। বৌদ্ধধর্মের অনুসারী এবং পৃষ্ঠপোষক রাজা ও মহারাজারা বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত এসব স্থানে বিহার, সঙ্ঘারাম, চৈত্য, স্তূপ ইত্যাদি নির্মাণ করেছেন। কিন্তু গৌতম বুদ্ধের জীবনের চারটি প্রধান ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল চারটি স্থানে। যেমন, তিনি জন্মগ্রহণ করেন নেপালের লুম্বিনী কাননে। বুদ্ধের সময়কালে স্থানটি কোশল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন বুদ্ধগয়ায়। বুদ্ধের সময়কালে স্থানটি মগধ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বুদ্ধত্ব লাভ করার পর বুদ্ধ তাঁর নবলব্ধ ধর্ম প্রথম প্রচার করেন সারনাথে। বুদ্ধের সময়কালে সারনাথ কাশী রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তিনি মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন কুশীনগরে। বুদ্ধের সময়কালে স্থানটি মল্ল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বুদ্ধের জীবনের চারটি প্রধান ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বলে এ চারটি স্থানকে মহাতীর্থস্থান বলে। বৌদ্ধরা জীবনে অন্তত পঁচেক একবার হলেও চারি মহাতীর্থস্থান দর্শন করতে চেষ্টা করেন।

#### অনুশীলনমূলক কাজ

চারি মহাতীর্থস্থান কী কী? এগুলোকে কেন মহাতীর্থস্থান বলা হয়?

পাঠ : ২

## বৌদ্ধ তীর্থস্থানের ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব

### ধর্মীয় গুরুত্ব

তীর্থস্থানসমূহের সজ্ঞা বুদ্ধ, তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য এবং অনেক বরেন্দ্র মনীষীর স্মৃতি জড়িত আছে। তীর্থস্থান ভ্রমণের ফলে তাঁদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। তাঁদের আদর্শ জীবন ও কর্ম মানুষকে নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। তীর্থস্থান ভ্রমণ পুণ্যের কাজ। বিশেষত দক্ষিণী, বুদ্ধগয়া, সারণাথ, কুশিনগর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করলে বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা মানসপটে জাগ্রত হয়। এতে মন অগাধ আনন্দে ভরে যায়। বিকল্প চিন্তা সংঘত হয়, উদারতা বাড়ে, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে। অকুশল কর্ম হতে বিরত থেকে কুশল কর্ম সম্পাদনে মন উৎসাহিত হয়। মৈত্রী, করুণা, সহনশীলতা এবং পরোপকারী মনোভাব সৃষ্টি হয়। তাই বলা যায়, তীর্থস্থানের ধর্মীয় গুরুত্ব অপরিসীম।

### ঐতিহাসিক গুরুত্ব :

তীর্থস্থান অতীত ইতিহাসের অক্ষয় সাক্ষী। তাই তীর্থস্থান ভ্রমণে ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। বৌদ্ধ তীর্থস্থানসমূহে শুধু বৌদ্ধ ধর্মীয় নয় বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনারও প্রামাণ্য দলিল। বুদ্ধ এবং প্রাচীনকালের রাজন্যবর্গ, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি এবং ধর্ম-দর্শনের নানা ঘটনা তীর্থস্থানসমূহের সজ্ঞা সমৃদ্ধ। যেমন, বৌদ্ধতীর্থ সঙ্গপী গৃহায় প্রথম বৌদ্ধ সঙ্ঘাতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সঙ্ঘাতিতে মহাক্ষপ সঙ্ঘবিরের নেতৃত্বে এবং পাঁচশত পণ্ডিত অর্ধে ভিক্ষুর উপস্থিতিতে প্রথম বুদ্ধবাহী সংগৃহীত হয়েছিল। জানা যায়, রাজা অজাতশত্রু প্রথম সঙ্ঘাতি অনুষ্ঠানে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। সুতরাং সঙ্গপী গৃহ ভ্রমণে ত্রিপিটক সংকলনের ইতিহাস জানা যায়। দক্ষিণী, বুদ্ধগয়া, সারণাথ, কুশিনগরের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, রাজা বিম্বিসার, অজাতশত্রু, প্রসেনজিত এবং শ্রেষ্ঠী অনাথপিড়িক প্রমুখ বরেন্দ্র ব্যক্তিগণ বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাছাড়া আরো জানা যায়, বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ, প্রথম ধর্ম প্রচার এবং মহাপরিনির্বাণ লাভের স্থানসমূহকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য সপ্তাট অশোক এসব স্থানে স্তূপ, স্তম্ভ, বিহার ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন। এসব স্তূপ, স্তম্ভে দ্বিপিবন্দ্র অনুশাসন থেকে সপ্তাট অশোকের শাসনপ্রণালি, ধর্মীয় ও প্রজা কল্যাণমূলক নানা সামাজিক কর্মকাণ্ড- সম্পর্কে জানা যায়। পণ্ডিতগণ প্রাচীন তীর্থস্থানগুলোকে অতীতের সত্যতা ও সংস্কৃতির ধারণা-বাহক হিসেবে গণ্য করেন। প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারগুলো শুধু ধর্ম নয়, নানা শাস্ত্রের শিক্ষাকেন্দ্রও ছিল। বুদ্ধ শিষ্যরা ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি দ্ব্যোতিষশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, গণিতশাস্ত্র, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদিও শিক্ষা দিতেন। তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী, ময়নামতি, পাহাড়পুর প্রভৃতি প্রাচীন যুগের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এ শিক্ষাকেন্দ্র গুলোর ইতিহাস পাঠে প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা ও বিহারজীবন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। তাই বলা যায় তীর্থস্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

### প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব :

তীর্থস্থানসমূহে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির নানা উপাদান ছড়িয়ে আছে। যেমন, বিভিন্ন তীর্থস্থানের ধ্বংসাবশেষ থেকে বিহারের অবকাঠামো, স্তূপ, স্তম্ভ, ভিক্ষুদের ব্যবহারের দ্রব্যসামগ্রী, বুদ্ধ-বোধিসত্ত্ব ও বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি, প্রাচীন মুদ্রা, পোড়ামাটি ও পাথরের চিত্রাঙ্কন, অনুশাসনলিপি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

এসব প্রত্নসামগ্রী হতে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। যেমন, অলঙ্কৃত ইস্টক ঘারা নির্মিত বিহারের অবকাঠামোতে সে যুগের উন্নত নির্মাণশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। অবিচ্ছিন্ন মুর্তিগুলো মূল্যবান পাথরে নিখুঁতভাবে নির্মিত, যা প্রাচীনকালের উন্নত ভাস্কর্য শিল্পের স্বাক্ষর বহন করে। চিত্রফলকগুলোতে তৎকালীন ধর্মীয় ও সমাজ জীবনের নানা কাহিনী অঙ্কিত আছে। স্তূপ ও স্তম্ভ শীর্ষে স্থাপিত অশু ও সিংহ মুর্তিগুলোতে অশ্লুপ শৈল্পিক সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেছে। এসব বিবেচনা করে বলা যায়, তীর্থস্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম।

### অনুশীলনমূলক কাজ

বিহারগুলোতে ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি আর কী শিক্ষা দেয়া হতো

পাঠ : ৩

লুম্বিনী

লুম্বিনী ছিল প্রাচীন কপিলাবস্তু ও দেবদাহ নগরীর মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি সুবৃহৎ মনোরম উদ্যান। রানী মহামায়া কপিলাবস্তু থেকে দেবদাহ নগরে পিঙ্গালয়ে যাবার পথে এ উদ্যানে সিংধার্য গৌতমের জন্ম হয়েছিল। গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান হিসেবে বিশ্বব্যাপী এ স্থানের পরিচিতি রয়েছে। বৌদ্ধদের কাছে লুম্বিনী মহাতীর্থস্থান হিসেবে খ্যাত। লুম্বিনী উদ্যান বর্তমানে বুদ্ধিন্দাই নামে খ্যাত, যা নেপালের বুটল জেলার ভদ্রবানপুর তহসিলের ৩ কিলোমিটার উত্তরে পরিয়া গ্রামে অবস্থিত। সম্রাট অশোক সিংধার্যের জন্মস্থান লুম্বিনী ভ্রমণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। জানা যায়, সম্রাট অশোক তাঁর রাজত্বের বিশেষতম বর্ষে স্থানটি পরিদর্শন করতে আসেন। তিনি বুদ্ধের জন্মের স্মৃতি বিজড়িত এই পুণ্যস্থানটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য এখানে একটি স্তূপ নির্মাণ করেন। চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং লুম্বিনী ভ্রমণকালে স্তূপটি দেখতে পান। স্তূপের সন্নিকটে শীর্ষদেশে অশ্বমূর্তি যুক্ত একটি প্রস্তর স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে স্তম্ভটি আবিষ্কৃত হয়। এটি 'অশোক স্তম্ভ' নামে পরিচিত। অশ্বমূর্তি সিংধার্যের সংসার ত্যাগের প্রতীক। স্তম্ভটি পরবর্তীকালে মাকঝানে ভেঙে গেলেও এর গায়ে যে শিলালিপি ছিল তা এখনো বর্তমান। শিলালিপিতে প্রাকৃত ভাষায় এরূপ খোদিত আছে - 'এ স্থানে শাক্যমুনি বৃষ জন্মগ্রহণ করেন'। স্তম্ভের গায়ে খোদিত অন্য অনুশাসনলিপি থেকে আরো জানা যায় যে, সম্রাট অশোক লুম্বিনী উদ্যান দর্শনের স্মারক এবং বুদ্ধের স্মৃতির প্রতি সম্মানার্থে এ স্থানকে ক্রমবৃত্ত করেছিলেন। প্রাচীনকালে এখানে একটি বৃহৎ সজ্জারাম ছিল। কালের প্রাসে সেটি ধ্বংস হয়ে গেলেও ঐ স্থানে কিছুকাল আগে আর একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিহারের ভেতরে সিংধার্যের জন্মকাহিনী চিত্রিত প্রাচীন একটি পাথরের ফলক আছে। ফলক চিত্রে মায়াদেবী বাম হাতে শালগাছের একটি ডাল ধরে আছেন। পাশে রয়েছে মায়াদেবীর বোন মহাপ্রজাপতি গৌতমী। অন্য পাশে দেবতার হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে নিচে একটি পয়ের উপর নবজাত সিংধার্য দাঁড়িয়ে আছেন। বিহারের বনভিদুরে অতীত ইতিহাসের সাক্ষী স্বরূপ একটি ছোট পুকুর আছে। কথিত আছে যে, সিংধার্যের জন্মের পূর্বে রানী মায়াদেবী এ পুকুরে স্নান করেছিলেন।



লুম্বিনী

বর্তমানে এখানে শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, জাপানসহ বিভিন্ন বৌদ্ধ দেশের বিহার ও অতিথিশালা আছে। নেপাল সরকার লুম্বিনীর উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রচুর দর্শনাভী লুম্বিনী ভ্রমণে আসেন। নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে সড়ক পথে লুম্বিনী যাওয়া যায়।

### অনুশীলনমূলক কাজ

লুম্বিনী কেন বিখ্যাত?

শিলালিপিতে প্রাকৃত ভাষায় কী লেখা ছিল?

## পাঠ : ৪

### বুদ্ধগয়া

বুদ্ধগয়া বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থস্থান। বুদ্ধগয়ার বৈদ্যুত্ন মূলে সিংহার্ঘ্য সৌতম বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন। তিনি যে অশুখ গাছের নিচে মহাজ্ঞান লাভ করেছিলেন সেই অশুখ গাছের নাম হয় ‘মহাবোধি বৃক্ষ’। যে আসনে বসে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন সেই আসনের নাম ‘বজ্রাসন’ বা বৈদ্যপালঙ্ক। এ আসনটি একটি অখণ্ড পাথরে নির্মিত। সম্রাট অশোক তাঁর রাজত্বকালে তীর্থ ভ্রমণে এসে অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে বজ্রাসনটি চিহ্নিত করেন। বুদ্ধগয়ায় সেই আসনটি এখনো আছে।

বুদ্ধগয়া মন্দির জগত বিখ্যাত। মন্দিরটি পূর্বমুখী। এটি একটি দ্বিতল ভবন। উপরের তলা থেকে মন্দিরটি ক্রমশ ছোট হয়ে গেছে। মন্দিরের শীর্ষদেশ গোলাকার। মন্দিরের চার কোণায় চারটি ছোট মন্দির আছে। সামনের দুটিতে ওঠার সিঁড়ি আছে। সিঁড়িতে দুটি পঞ্চপাখি বোধিসত্ত্বের মূর্তি অঙ্গরূপে খোঁজা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মূল মন্দিরের গর্ভগৃহে আছে অবলোকিতেশ্বরের বোধিসত্ত্বের দাঁড়ানো মূর্তি। মন্দিরের গায়ে সারিবদ্ধ কুণ্ডলিতে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ দেবদেবীর অনেক মূর্তি আছে। এগুলো পাথরে খোদাই করা। মন্দিরের ভেতরে ও বাইরে সারা দেয়ালে অঙ্গরূপ কারুকাজ আছে। স্বয়ংসত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এ মন্দির।

মূল মন্দিরের ভিতরে আছে ভূমিশ্রী মূর্তির বসা বড় বুদ্ধমূর্তি। বুদ্ধসনে সিংহ ও হস্তীমূর্তি আছে। বাইরে পাঁচটি কক্ষে সারিবদ্ধ ৫টি বুদ্ধমূর্তি আছে। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল ও প্রথম কে প্রতিষ্ঠা করেছেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে পণ্ডিতদের ধারণা, এ মন্দিরটি সম্রাট অশোক, তৎপূর্ববর্তী মিত্রবংশীয় রানী কুমাংগী ও নাগদেবী এবং আরো পরে কুম্ভাবংশীয় ষষ্ঠ রাজা কনিষ্ক প্রমুখের পর্যায়ক্রমিক সহযোগিতা দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। সপ্তম শতকে হিজরেন সাং বুদ্ধগয়া ভ্রমণে আসেন। তিনি মন্দিরটির বিবরণ ভ্রমণ বিবরণীতে লিখে রাখেন। তিনি লিখেছেন, মন্দিরটি ১৬০ ফুট উঁচু। এর প্রশস্ত ভূমির উপর বিশটি সিঁড়ির ধাপ বর্তমান। সুবৃহৎ মন্দিরটি ইটের দ্বারা নির্মিত। তিনি এখানে সম্রাট অশোক নির্মিত আরো একটি অলঙ্করণসমৃদ্ধ চৈত্যগৃহ দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

মন্দিরের আশে পাশে ‘সপ্ত মহাস্থান’ অবস্থিত। বুদ্ধজন্ম লাভের পর সেসব স্থানে বুদ্ধ সাত সপ্তাহ অবস্থান করেন। এজন্য এ সাতটি স্থান সপ্ত মহাস্থান নামে পরিচিত। সপ্ত মহাস্থান হলো : বোধিপালঙ্ক, অনিমেধ চৈত্যা, চক্রমণ চৈত্যা, রত্নমণ চৈত্যা, অজপাল ন্যাগ্রোথ বৃক্ষ, মুচলিন্দ মূল ও রাজায়তন বৃক্ষ। মন্দিরের উত্তর পাশে বুদ্ধের পদচিহ্ন খোদাই করা পাথর আছে। মন্দিরের চারদিকে রয়েছে উঁচু পাথরের প্রাচীর। প্রাচীরের গায়ে বুদ্ধের জীবনের বহু ঘটনা ও জাতকের কাহিনী খোদাই করা আছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিবছর অগণিত মানুষ বুদ্ধগয়ায় শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসেন। বৌদ্ধরা সেখানে মা-বাবা ও পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ড-দান করেন। অনেকে শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষিত হন। এখানে তীর্থযাত্রীদের থাকার সুব্যবস্থা আছে। মহাবোধি সোসাইটি, বিজ্ঞান মন্দির, সঙ্কীর্



বুদ্ধগয়া মন্দির

হাউজ ইতাদিতে তীর্থযাত্রী থাকার সুব্যবস্থা আছে। এছাড়া রয়েছে চীন, জাপান, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড-, ফুটান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধদের নিজস্ব বিহার ও অতিথিশালা। বুদ্ধগয়া মন্দিরের অনুরে একটি জাদুঘর আছে। এখানে বুদ্ধগয়ায় গ্রাণ্ড প্রভুকে সমূহ সংরক্ষিত আছে।

ভারতের বিহার রাজ্যের রাজধানী গয়া থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে বুদ্ধগয়া। বুদ্ধগয়া নৈরঞ্জনা নদী তীরে অবস্থিত। নৈরঞ্জনার বর্তমান নাম ফল্গু। বুদ্ধ এ স্থানে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। তাই এ স্থানের নাম হয় বুদ্ধগয়া। বুদ্ধগয়া থেকে সড়ক পথে রাজগৃহ, নালন্দা প্রভৃতি তীর্থস্থানে যাওয়া যায়।

### অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধগয়া কেন বিখ্যাত?

সমস্ত মহাস্থানের নাম বল।

### পাঠ : ৫

### সারনাথ

সারনাথ বর্তমানে ভারতের উত্তর প্রদেশের বারাণসী শহরের অনতিদূরে বরুণা নদীর তীরে অবস্থিত। প্রাচীনকালে স্থানটি 'ইসিপতন মুগদাব' নামে পরিচিত ছিল। ইতোপূর্বে আমরা ন্যাশ্রোবমুগ জাতকে মুগদাবের বর্ণনা পাড়েছি। বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ এ স্থানে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট প্রথম ধর্ম প্রচার করেন। সেদিন ছিল শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি। পঞ্চবর্গীয় শিষ্যগণ হলেন : কৌন্ডিন্য, বল্ল, ভদ্রীষ, মহানাম ও অশ্বজিৎ। বুদ্ধ এ পাঁচজন শিষ্যের কাছে প্রথম যে ধর্ম দেশনা করেন তা বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র' নামে পরিচিত। এ সূত্রেই আছে চতুরার্য সত্য এবং দুঃখ মুক্তির সঠিক পথ মধ্যম পন্থ বা 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ'। বুদ্ধের প্রথম ধর্ম প্রচারের স্থান হিসেবে সারনাথ মহাতীর্থস্থানের মর্যাদা লাভ করে।



সারনাথে বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের ধর্ম দেশনা করছেন



প্রথম ধর্মদেশনা ছাড়াও নানা কারণে সারনাথের গুরুত্ব অপরিসীম। পঞ্চবঙ্গীয় শিষ্যদের ধর্ম দেশনা করার পর বারাণসীর শ্রুতীপুত্র যশ ও তাঁর চ্যাদ্বজন বশুককে বৃন্দ এ সঙ্ঘে প্রব্রজ্যা দিয়েছিলেন। এই একাদ্বজন, পঞ্চবঙ্গীয় শিষ্যবৃন্দ এবং আরো চারজনসহ মোট ষাটজন ভিক্ষু নিয়ে প্রথম ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম বিধিবদ্ধ সঙ্ঘ। বৃন্দ সর্বপ্রাণির হিতের জন্য, মঙ্গলের জন্য এই ষাটজন ভিক্ষুকে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর ধর্মবান্ধী প্রচারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এছাড়া বৃন্দ এখানে বহু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দেশনা করেন।

সারনাথ বৌদ্ধধর্মের প্রাণকেন্দ্র ছিল। শতশত ভিক্ষু-ভিক্ষুণী এখানে বাস করতেন। ধর্মচক্র প্রবর্তনের স্মারক হিসেবে সস্তুটি অশোক এখানে একটি স্তূপ নির্মাণ করেন। স্তূপটি পাথরের তৈরি। এর উচ্চতা ছিল ১৪৫ ফুট এবং প্রস্থ ছিল ৯৪ ফুট। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং স্তূপটি দেখেছিলেন। এখানে একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। সারনাথের ধ্বংসস্থ স্তূপ বৌদ্ধযুগের অনেক নির্দর্শন পাওয়া গেছে। এখানে ৮৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট আরো একটি স্তূপ দেখা যায়। এটি 'চৌখন্ডি স্তূপ' নামে পরিচিত। পণ্ডিতগণ ধারণা করেন, পঞ্চবঙ্গীয় শিষ্যদের সঙ্ঘে বৃন্দেবের এখানেই প্রথম সাফাং হয়েছিল এবং তারই স্মারক হিসেবে স্তূপটি নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া ৭১ ফুট উঁচু ও ৩ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট বেলে পাথরের একটি স্তূপ আছে। স্তূপটির মাথায় চার মুখ বিশিষ্ট সিংহমূর্তি আছে। তার উপর একটি ধর্মচক্র আছে। চক্রটি সাম্য, মৈত্রী, শান্তি ও প্রগতির প্রতীকরূপে ভারতীয় জাতীয় পতাকায় সন্মান পেয়েছে। স্তূপটি ভেঙে যাওয়ার সিংহমূর্তিটি সারনাথের সংগ্রহশালায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। মূলদাবের অঙ্গুর 'সাম্য স্তূপ' দেখা যায়। এতে বৃন্দেবের দেহাত্ম ছিল বলে ধারণা করা হয়। স্তূপটির চারদিকে বাঁধানো চত্বর আছে। সেখানে তীর্থযাত্রীরা ঘুরে ঘুরে গ্রিরেন্ডের নাম স্মরণ করেন।



সারনাথের বৌদ্ধ পুরস্মৃতি

এখানে মৃগালম্বকুটির বিহার নামে একটি সুবৃহৎ বিহার ছিল। ভগবান বৃন্দ যে কুটিরটিতে বাস করতেন তাকে মৃগলম্বকুটির বলা হয়। হিউয়েন সাং বিহারটি ১০০ ফুট উচ্চ বলে বর্ণনা করেছেন। বিহারটি শৈল্পিক কাব্যকার্য খচিত ইটক দ্বারা নির্মিত ছিল। তিনি এ বিহারে দেড় হাজার ভিক্ষুকে বসবাস করতে দেখেন। ভারতের

মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা অনাচারিক ধর্মপালের প্রচেষ্টায় বিহারটি পুনরায় নির্মাণ করা হয়। এখানে বুদ্ধের দেহখাত আছে, যা বছরে একবার জনসাধারণকে দেখার সুযোগ দেওয়া হয়। কথিত আছে যে, এখানে 'সম্বন্ধাচরজিন' নামে একটি সুবৃহৎ সজ্জারাম ছিল। এখানে একটি বোধিবৃক্ষের নিচে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের উপদেশের বুদ্ধের মূর্তি আছে। দূর থেকে দেখতে বৃক্ষ ও তাঁর পাঁচ শিষ্যকে জীবন্ত বলে মনে হয়।

সারণাথে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার অনন্য নিদর্শন বহু বিহার, সজ্জারাম, স্তূপ ও স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এখানে ধর্মচক্র মূর্ত্যু উপবিন্দি একটি বুদ্ধমূর্তিও পাওয়া গেছে। এগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য অপরিসীম।

বারাণসীর রেলস্টেশন থেকে সড়ক পথে সারণাথ যাওয়া যায়। এছাড়া সারণাথের কাছেও একটি রেলস্টেশন আছে। এখানে তীর্থযাত্রীদের জন্য ধর্মশালা ও সরকারি অতিথিশালা আছে।

### অনুশীলনমূলক কাজ

পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নাম বল।

সারণাথে কী কী বৌদ্ধ নিদর্শন রয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

## পাঠ : ৬

### কুশীনগর

কুশীনগর বৌদ্ধদের অন্যতম পবিত্র তীর্থভূমি। এখানে গৌতম বুদ্ধ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। প্রাচীনকালে কুশীনগর বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যেমন, কুশীনারা, কুশীগ্রাম, কুশাবতী ইত্যাদি। ভারতের উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলার কেশিয়া নামক স্থানে এটি অবস্থিত। এটি বৌদ্ধদের চার মহাতীর্থস্থানের অন্যতম। প্রাচীনকালে কুশীনগর হিরণ্যবর্তীর পশ্চিম তীরে ছিল। তখন এটি মল্ল রাজ্যের রাজধানী ছিল।

কুশীনগরের অনতিদূরে পাবা। পাবার ধর্মী পুত্র চন্দ্র গৌতম বুদ্ধকে প্রথম দেখেই হ্রোতপ্তি ফল লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর নিজের আমবাগানে বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেছিলেন। পরিনির্বাণের আগের দিন বুদ্ধ সেখানে গৌছলে চন্দ্র তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সে সময় বুদ্ধ চন্দ্রের ঘরে আহার করেন। এটিই তাঁর শেষ আহার। এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। অন্তিম শয্যায় বুদ্ধ পরিব্রাজক সুভদ্রকে লীখা দেন। সুভদ্র ছিলেন বুদ্ধের শেষ শিষ্য। তারপর তিনি ভিক্ষুদের উদ্দেশে শেষ উপদেশ দান করেন। ভিক্ষুদের শেষ উপদেশ স্বরূপ তিনি বলেছিলেন, 'ভিক্ষুগণ! সমস্ত সংস্কার অনিত্য, ক্ষয়শীল। তোমরা অশ্রমাদের সাথে শ্রীর কর্তব্য সম্পাদন কর।' অতঃপর তিনি মন্ত্রদের জোড়া শালগাছের নিচে অন্তিম শয্যায় শায়িত অবস্থায় বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

পুণ্ড সম্রাট কুমারগুপ্তের সময় হরিবল নামক এক বৌদ্ধ দাতা এখানে দীর্ঘ ২২ হাত লম্বা একটি শাস্তিত বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করেন। এটি এখনো তীর্থযাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর পাশে একটি বড় স্তূপ আছে। এর মধ্যে একটি 'পরিনির্বাণ তন্ত্রপট' নামে তামার পাত দেখা যায়। সম্রাট অশোক এই স্থান পরিদর্শন করে বুদ্ধের পরিনির্বাণ স্থান নির্দিষ্ট করেন। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন কুশীনগর ভ্রমণ করেন। তিনি এখানে লোকবসতি বেশি দেখেননি বলে লিখে গেছেন।

উত্তর ভারতের গোরক্ষপুর রেলস্টেশনে থেকে সড়ক পথে কুশীনগর যাওয়া যায়। এখানে যাত্রীদের জন্য অতিথিশালা আছে। বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কুশীনগর ও লুম্বিনী এই চার মহাতীর্থ সড়ক পথে যাওয়া যায়। বাংলাদেশ থেকে বহু তীর্থযাত্রী বাসে করে দল বেঁধে চার মহাতীর্থস্থান দেখতে যান।

### অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধ শেষ উপদেশ স্বরূপ কী বলেছিলেন?

বুদ্ধের শেষ শিষ্য কে ছিলেন?

### অনুশীলনী

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। গৌতমবুদ্ধ কত বছর বয়সে বুদ্ধত্ব লাভ করেন?

ক. ১৯

খ. ২৯

গ. ৩৫

ঘ. ৪৫

২। বৌদ্ধদের নিকট কুশীনগর অন্যতম পবিত্র স্থান কেন?

ক. বুদ্ধের জন্মস্থানের জন্য

খ. বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের জন্য

গ. বুদ্ধত্ব লাভের কারণে

ঘ. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের জন্য

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

জয় মুৎসুন্দী তার বাবার সাথে কাঠমুড় ভ্রমণ করতে যান। সে স্থানে বিহারের ভিতরে একটি পাথরের ফলক দেখতে পান। ফলক চিত্রে মায়াদেবী বাম হাতে শালগাছের একটি ডাল ধরে আছেন, পাশে তাঁর সোন মহাপ্রজাপতি গৌতমী। বিহারের অনতিদূরে একটি পুকুরও আছে।

৩। জয় মুৎসুন্দীর দর্শনীয় স্থানটি কোন স্থানের হস্তিাত বহন করে?

ক. লুম্বিনীর

খ. বুদ্ধগয়ার

গ. সারানীথের

ঘ. কুশীনগরের

৪। উক্ত স্থান দর্শন করে জয় মুৎসুদী শিখা লাভ করবে -

- i. শৈল্পিক সৌন্দর্য
- ii. সভ্যতা ও সংস্কৃতি
- iii. ধর্মীয় জ্ঞান

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |            |                |
|------------|----------------|
| ক) i ও ii  | খ) ii ও iii    |
| গ) i ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

#### সুজানশীল প্রশ্ন:

১। প্রবেশ্য দেবমিত্রা ভিক্তু গ্রামের আগ্রহী দায়ক-দায়িকাদের নিয়ে কার্তিকী পূর্বাহ্নের পর তীর্থস্থান দর্শন করার জন্য ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। তারা প্রথমে যে স্থান পরিভ্রমণ করেন সেখানে উঁচু একটি বৌদ্ধ মন্দির দেখতে পান। তাছাড়া সে স্থানে গিয়ে একটি অখণ্ড পাথরে নির্মিত বজ্রাসন দর্শন করেন।

- ক. বুধ কোথায় তাঁর নবলঙ্ঘ ধর্ম প্রচার করেন ?
- খ. সৌতম বুধের কোন ঘটনা কুশীনগরের সাথে জড়িত ? ব্যাখ্যা কর।
- গ. দায়ক-দায়িকাদের দর্শনকৃত বিহারটি পাঠ্যবইয়ের কোন মহাতীর্থের ইঙ্গিত বহন করে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদীপকে বর্ণিত দর্শনীয় স্থানটির ধর্মীয় গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তক কেন আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। পরীক্ষা শেষে চুমকী বড়ুয়া তার পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে একটি তীর্থস্থান দর্শনের জন্য নেপালে যান। তারা উক্ত তীর্থস্থানে বৌদ্ধধর্মের অনেক প্রাচীন নিদর্শন দেখতে পান। পাঁচজন শিষ্যের নিকট বুধের দেশানারত একটি ছবি তাঁদের নজরে পড়ে। তাছাড়া বৌদ্ধ সভ্যতার অনেক বৌদ্ধমূর্তি ও স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষও তাদের আকৃষ্ট করে। উক্ত বিহার দর্শনের এক পর্যায়ে চুমকী বড়ুয়ার বাবা বললেন, এসব তীর্থস্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিণীম।

- ক. সৌতম বুধ কোথায় বুধত্ব লাভ করেন ?
- খ. লুম্বিনী মহাতীর্থস্থান হিসেবে খ্যাত কেন ? ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদীপকে বর্ণিত বিহারটি কোন তীর্থস্থানের কথা নির্দেশ করে ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. তীর্থস্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিণীম-চুমকী বড়ুয়ার বাবার বক্তব্যের সঙ্গে তুমি কি একমত? বৌদ্ধ তীর্থস্থান অন্বেষণের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

**শূন্যস্থান পূরণ কর :**

১. পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি . . . লাভ করেন।
২. তীর্থস্থান অরণ . . . কাজ।
৩. লুম্বিনী উদ্যান বর্তমানে . . . নামে খ্যাত।
৪. বুদ্ধগয়া . . . নদীর তীরে অবস্থিত।
৫. মোট . . . ভিক্ষু নিয়ে ভিক্ষুসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

**মিলকরণ :**

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর

| বাম                             | ডান   |
|---------------------------------|---|
| ১. সৌতম বুদ্ধ                   | ইতিহাসের অনন্য সাধী                           |
| ২. বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন | বর্তমান নেপালের লুম্বিনী কাননে জন্মগ্রহণ করেন |
| ৩. তীর্থস্থান অতীত              | পুরুত অপরিণীম                                 |
| ৪. তীর্থস্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক | একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে               |
| ৫. প্রাচীনকালে এখানে            | কুশীনগরে                                      |

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. তীর্থস্থান সমূহের ধর্মীয় গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
২. লুম্বিনী কাননে সিদ্ধার্থের জন্মকহিনী বর্ণনা কর।
৩. বোধিপালঙ্ক কী?
৪. বুদ্ধের সম্বন্ধীয় শিষ্য কারা? তাঁরা কেন বিখ্যাত?

**রচনামূলক প্রশ্ন:**

১. বৌদ্ধ তীর্থস্থান সমূহের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
২. বৌদ্ধধর্মে কুশীনগরের গুরুত্ব সম্পর্কে যা জানো লিখ।

## একাদশ অধ্যায়

### বৌদ্ধধর্মে রাজন্যবর্ণের অবদান : সম্রাট কণিষ্ক

বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারের বহু রাজা ও রাজন্যবর্ণের অবদান ছিল। তাঁদের মধ্যে রাজা বিহিসার, অজাতশত্রু, প্রসেনজিত, অশোক, কণিষ্ক ছিলেন অন্যতম। ইতোপূর্বে আমরা রাজা বিহিসার, সম্রাট অশোক সম্পর্কে পড়েছি। এ অধ্যায়ে সম্রাট কণিষ্ক সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- সম্রাট কণিষ্কের জীবন কাহিনী বর্ণনা করতে পারব ;
- বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে সম্রাট কণিষ্কের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা এবং শিল্পকলা ও স্থাপত্যে সম্রাট কণিষ্কের অবদান মূল্যায়ন করতে পারব।

পাঠ : ১

#### সম্রাট কণিষ্ক

সম্রাট কণিষ্ক ছিলেন কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। কুষাণগণ চীন সীমান্ত থেকে আগত ইউ-টি জাতির শাখা। ইউ-টি জাতি চীন সীমান্তে বাস করত। কালক্রমে তারা শকদেরকে পরাজিত করে অন্ধ নদীর তীরে বসবাস করতে থাকে। পরে পঞ্চবন্দের রাজ্য অধিকার করে সেখানে স্থায়ী বসবাস শুরু করে। ইউ-টি জাতির পাঁচটি শাখার মধ্যে কুষাণগণ সর্বশ্রেষ্ঠ। শক্তিশালী ছিল।

কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কণিষ্ক। তাঁর রাজত্বকাল খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক। তিনি খোঁটাসের রাজ্য বিজয়কীর্তি ও বৌদ্ধ দার্শনিক নাপার্জুনের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি উত্তর ভারত সম্পূর্ণ জয় করেছিলেন। গান্ধার এবং কাশীর থেকে বেনারস পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁর সম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনি রাজ্য জয়ের দেশায় নিয়মিত সৈন্যদল নিয়ে পরিভ্রমণ করতেন। তিনি কাশীরে কণিষ্কপুর নামক একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি গৌড়য়ারে (পুর্নুপুর্নো) স্থায়ী প্রাসাদ গড়ে তুলেছিলেন। কণিষ্কের সিংহাসনে আরোহণের বছর থেকে তিনি একটি নতুন অক্ষর প্রবর্তন করেছিলেন। তা শকাব্দ নামে পরিচিত ছিল।

সম্রাট কণিষ্ক নিজের সৈন্যদল পরিচালনা করতেন। বৃষ্ণ বয়সে তিনি এক বিশাল সৈন্যদল নিয়ে সুভ-লিঙ্গ পর্বত অতিক্রম করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। সুভ-লিঙ্গ পর্বত পামীর উপত্যকা ও হোটােনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল।

সম্রাট কণিষ্ক অত্যন্ত জনদরদী রাজা ছিলেন। জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তক্ষশীলা দলিল থেকে জানা যায় যে, জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ‘দেবপুত্র’ উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষির সম্প্রসারণেও উদ্যোগী ছিলেন। রোমের স্বর্ণমুদ্রা ‘রোমান সলিডাস’ এর অনুকরণে সম্রাট কণিষ্ক তাঁর সম্রাজ্যে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন।

কবিষ্ক তাঁর শাসন ব্যবস্থা বিবেচনাকরণ করেছিলেন। তাঁর শাসনব্যবস্থায় সর্বনিম্ন স্তরে ছিল গ্রাম। গ্রামের প্রধানকে 'গ্রামিক' বলা হতো। 'নবকর্মিক' নামে এক ধরনের কর্মচারী ছিল যারা ধর্ম ও সেবামূলক কাজগুলোতে সহায়তা করতেন। সমগ্র সাম্রাজ্য পূর্বদিক ও উত্তরদিক দুইভাগে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক শাসক নিয়োগ করে পরিচালনা করা হতো। এই শাসকগণ 'মহাক্ষত্রপ' নামে অভিহিত হতো। মহাক্ষত্রপগণের সহযোগীদের বলা হতো 'অত্রপ'। অত্রপগণ আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। অত্রপদের অনেক 'রাজা' অভিধায়ও ব্যাৎ হতেন।

সম্রাট কবিষ্ক বৌদ্ধধর্মের মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের কিছুকাল পূর্বে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। রাজ্য জয়ের চেয়ে তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রসারের পৃষ্ঠপোষকতা করেই ব্যতি অর্জন করেন। মৌর্যযুগে বৌদ্ধধর্মের বেশ প্রভাব থাকলেও পরবর্তী সময় তা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু সম্রাট কবিষ্কের আমলে বৌদ্ধধর্ম আবার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে সজীব হয়ে ওঠেছিল। তাঁর স্বর্ণ ও তাম্র মুদ্রায় গ্রিক, হিন্দু ও নানা দেব-দেবীর মূর্তি অঙ্কিত ছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সম্রাট কবিষ্ক বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও খুবই পরমতসহিষ্ণু ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করতেন এবং সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন।

### অনুশীলনমূলক কাজ

কি কারণে সম্রাট কবিষ্ক বেশি ব্যতি লাভ করেছিলেন ?

তিনি কোন দেবপুত্র উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন ?

পাঠ : ২

### বৌদ্ধশিল্প ও স্থাপত্য বিকাশে কবিষ্কের অবদান

বৌদ্ধশিল্প ও স্থাপত্য বিকাশে সম্রাট কবিষ্কের অবদান ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। মৌর্য আমলে বৌদ্ধ শিল্পকলার উদ্ভব হলেও এর বিকাশ ঘটেছিল কুষাণ আমলে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে কুষাণ আমলে গান্ধার অঞ্চলে গ্রিক ভাবধারায় এক শিল্প রীতির উদ্ভব হয়, যা গান্ধারা শিল্পকলা নামে পরিচিত। ক্রমে গ্রিক ভাবধারা বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শে এসে গান্ধারা শিল্পরীতি নতুন মাত্রা যোগ হয়। এ শিল্পরীতি অনুসরণ করে সম্রাট কবিষ্কের রাজত্ব কালে প্রথম বুদ্ধমূর্তি তৈরির সূচনা হয়। সম্রাট কবিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্প উৎকর্ষতা লাভ করে সমগ্র ভারতবর্ষ এবং বহির্বিদেশে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কুষাণ সম্রাটদের প্রবর্তিত শিল্প ও স্থাপত্য রীতি বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক ও শিল্পাচার্যদের মাধ্যমে চীন, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া ও জাপানে প্রচার লাভ করে।



কৃষ্ণ মূর্তির সামনে সন্ন্যাস কণিষ্ঠ

কুমাণ শিল্প প্রধানত দুটি ধারায় আত্মপ্রকাশ করে। একটি গাম্ভীর্য শিল্প এবং দ্বিতীয়টি মধুরা শিল্প। এ দুই শিল্পের আদর্শই ছিল শান্তি, সম্বন্ধীতি ও মানবতাবোধের প্রকাশ। শাস্ত্রে উল্লিখিত সৌম্য সিন্ধু দৃষ্টি সম্পন্ন বুকের কল্পিত প্রতিরূপ এবং বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী গাম্ভীর্য এবং মধুরা শিল্পকর্মের অন্যতম উৎস ও প্রেরণা ছিল। পেশোওয়ারে কণিষ্ঠের রাজত্বকালে নির্মিত বৌদ্ধ মূর্তি ও বৌদ্ধ বিহারগুলোর স্মরণীয় শৈলী আজও শিল্প জগতের অনন্য বিময় হিসেবে মানুষের প্রশংসা করে।

#### অনুশীলনমূলক কাজ

গাম্ভীর্য শিল্পরীতি কী?

কুমাণ শিল্প প্রধানত কয়টি ধারায় আত্মপ্রকাশ লাভ করেছিল?

পাঠ : ৩

### বৌদ্ধধর্মে সন্ন্যাস কণিষ্ঠের অবদান

বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে সন্ন্যাস কণিষ্ঠ বিশেষ অুমিকা রেখেছিলেন। এ কারণে তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে সমগ্র রাজ্যে মানবীয় মূল্যবোধকে জাগাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর কুলপুরু ছিলেন সংঘরক্ষ। তিনিও সুপণ্ডিত ছিলেন। সন্ন্যাস কণিষ্ঠের মতো সন্ন্যাস কণিষ্ঠও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের মাধ্যমে সর্বজনীন মানবিক মূল্যবোধকে জুড়ে ধরেন এবং ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি



হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি প্রথমে রাজ্য বিস্তারের মনোযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে সেই রাষ্ট্রনীতি পরিত্যাগ করে তিনি ধর্মনীতি গ্রহণ করেছিলেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, রাজ্য বিস্তারের চেয়ে ধর্মনীতি প্রতিষ্ঠাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি পাটলিপুত্র জয় করে ফিরে আসার সময় বুদ্ধের কাষ্ঠ নির্মিত মূর্তি, ভিক্ষাপাত্র ও মহাকবি অশ্বমেধকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। পরে তিনি সে বুদ্ধমূর্তি ও ভিক্ষাপাত্র রাজধানী পুণ্ড্রবপুরে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অশ্বমেধকে পুণ্ড্রবপুর বিহারে অবস্থান করার জন্য অন্বেষণ করেন। এ বিহারটি কালক্রমে কণিষক বিহার নামে পরিচিতি লাভ করে। সম্রাট কণিষকের সময় অশ্বমেধের খুবই সুখ্যাতি ছিল। তিনি বহুবিশ পুণ্ড্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি মহাকবি, দার্শনিক ও প্রতিভাশালী বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। এছাড়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে তিনি গায়ক, নায়ক, গীতিকার, সুরকার, সংগঠকও ছিলেন। তবে মহাকবি হিসেবেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। মহাকবি অশ্বমেধের কারণে সম্রাট কণিষকের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে আজও উভয়ের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। অশ্বমেধের সূত্রাঙ্ককার গ্রন্থে সম্রাট কণিষকের পূর্ব ভারত জয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত আছে।

সম্রাট কণিষক পাটলিপুত্র জয়ের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য পুণ্ড্রবপুর স্তূপ ও বিহার নির্মাণ করেছিলেন। সম্রাট অশোকের 'দেবানামগি' আখ্যা নিয়ে পালি সাহিত্যে যেমন নানা কাহিনী প্রচলিত আছে, সেদৃশ সম্রাট কণিষকেরও 'দেবপুর' উপাধি নিয়ে অনেক কথা ও কাহিনী সৃষ্টি হয়। মহাযানী বৌদ্ধরা তাঁকে দেবতা হিসেবে গণ্য করেন।

সম্রাট কণিষক ইতিহাসে প্রধানত দু'টি কারণে অমর হয়ে আছেন। প্রথমত তিনি যে বছর সিংহাসনে আরোহণ করেন সে বছর থেকে শকাব্দ প্রচলিত হয়। দ্বিতীয়ত তিনি বৌদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক হিসেবে জগৎজয়ের কণিষক বিহারে বৌদ্ধ সজ্ঞীতি আহ্বান করেন। এটি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে চতুর্থ মহাসজ্ঞীতি নামে খ্যাত। সম্রাট কণিষক বুদ্ধের পুত্রসিদ্ধির ওপর স্তূপ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এছাড়া বহু বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্মারনে স্তূপ ও বিহার প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর রাজকর্তৃক অবসরে বৌদ্ধধর্ম চর্চা করতেন। তিনি বুদ্ধাবগীর বিভিন্ন বাখ্যা দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি অনুসন্ধান করে দেখলেন, বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব নিয়েও সত্যের মধ্যে মতামৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। তখন তিনি ধর্মপুত্র পার্শ্বের সহযোগিতায় এক সজ্ঞীতির অবিবেশন আহ্বান করেন। প্রখ্যাত দার্শনিক বসুমিত্রের সভাপতিত্বে এ মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ভিক্ষুসমূহের মধ্য থেকে পঁচাত্তর ভিক্ষু সজ্ঞীতির জন্য নির্বাচিত হন। অশ্বমেধ মহাসভাপতি হিসেবে সজ্ঞীতিতে উপস্থিত ছিলেন।

তারা সম্মিলিতভাবে মহাবিভাঙ্গশাস্ত্র নামক ত্রিপিটকের টীকাগ্রন্থ রচনা করেন। এ সম্মেলনে মূল ত্রিপিটক সংগৃহীত হয়নি। পালি ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষায় মহাবিভাঙ্গশাস্ত্র রচিত হয়েছিল এবং গ্রন্থটি মহাকবি অশ্বমেধের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়েছিল। মহাবিভাঙ্গশাস্ত্র সর্বপ্রথম বাদী সজ্ঞীতির মূল ধর্মগ্রন্থ জ্ঞানসংস্থান শায়ে র টীকাগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। এ কারণে এ সজ্ঞীতিকে সর্বপ্রথম বাদী সজ্ঞীতিও বলা হয়। বসুমিত্রের অস্তিত্বকালে মহাবিভাঙ্গশাস্ত্রে র অনুক্রমে রচিত। সজ্ঞীতি শেষে সমগ্র মহাবিভাঙ্গশাস্ত্র তত্ত্বফলকে খোদাই করে সতরকণ করা হয়েছিল। মহাবান ধর্মগ্রন্থ রচনার কারণে এ সজ্ঞীতির পুণ্ড্র অত্যধিক।

এ সংগীতিতে সর্বস্তি বাদীদের প্রধান ভূমিকা ছিল। সম্মেলন শেষে বিভিন্ন স্থানে ধর্ম প্রচারক প্রেরণ করা হয়েছিল। এ সর্বস্তি বাদই মহাবান বৌদ্ধধর্ম নাম ধারণ করে তিব্বত, মজ্জলিয়া, চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে প্রবেশ করে।

সম্রাট কণিষক সাহিত্যানুরাগীও ছিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন : মহাকাবি অশ্বমেধ, দার্শনিক নানার্জুন ও বসুমিত্র এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে র গ্রন্থ রচয়িতা চরক, পার্শ্ব, সংখরক ও মঠর প্রমুখ। তাঁরা সম্রাট কণিষকের শাসনামলে ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান এবং শিল্পকলার চর্চা ও বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। সম্রাট কণিষক তাঁর সাম্রাজ্যে সৃজনশীল কল্যাণকর্মে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সেসব অমরকীর্তির কারণে তিনি এখনো বিশ্বের ইতিহাসে অমরীয় হয়ে আছেন। মথুরার কাছে মাত নামক স্থানে খননকার্যের ফলে সম্রাট কণিষকের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি পাওয়া গেছে। এছাড়া বিভিন্ন মূর্তি ও স্মারকচিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে, যা সম্রাট কণিষকের স্মৃতি ও ইতিহাসকে আমাদের সামনে তুলে ধরে।

### অনুশীলনমূলক কাজ

মহাকাবি অশ্বমেধ কী কী পুণের অধিকারী ছিলেন?

সম্রাট কণিষকের আমলে অনুষ্ঠিত সংগীতিতে কে সভাপতিত্ব করেন?

সম্রাট কণিষকের রাজসভার পণ্ডিতদের নাম বল

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সম্রাট কণিষক খ্রিস্টীয় কত শতকে রাজত্ব করেন ?

ক. প্রথম

খ. দ্বিতীয়

গ. তৃতীয়

ঘ. চতুর্থ

৩। বৌদ্ধ ইতিহাসে সম্রাট কণিষক অমর হয়ে আছেন –

i. শব্দ প্রচলন করায়

ii. বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করায়

iii. দেবপুত্র উপাধি লাভ করায়।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক) i ও ii  
খ) ii ও iii  
গ) i ও iii  
ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

প্রদীপ চৌধুরী একজন জনদরদী জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান। তিনি এলাকার উন্নয়নে রাস্তাঘাট, পর্যটনশ্রম, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণে অগ্রণী শ্রমিক পালন করেন। এছাড়া তিনি এলাকার ঐতিহ্য রক্ষার্থে ফলক ও স্তম্ভ নির্মাণ করে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

৪। প্রদীপ চৌধুরীর কর্মকাণ্ডে কোন সফ্রটের অনুকরণের ছাপ রয়েছে ?

- ক. অশোক  
খ. বিশ্বাসার  
গ. কণিক  
ঘ. প্রসেনজিত

৪। প্রদীপ চৌধুরীর কর্মকাণ্ডে উক্ত সফ্রটের স্থাপত্যকর্মের কোন শিকার অনুশ্ররণ লাভ করেছিলেন ?

- ক. জনকল্যাণের  
খ. আব্রহামলিকার  
গ. কর্মের প্রতি সচেতনতার  
ঘ. ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১। উথোয়াই মং মার্মী এলাকার একজন প্রভাবশালী জমিদার। তাঁর স্বভাব ছিল শান্ত ও কোমল প্রকৃতির। কিন্তু এলাকাবাসীর ধর্মের প্রতি উদাসীন থাকায় তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও কলহ বিবাদ জেগে থাকত। এ দৃশ্য তাঁকে ব্যথিত করে তোলে। এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় তিনি বল প্রয়োগের পরিবর্তে ধর্ম চর্চার প্রতি বেশি জোর দেন। সকল ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রকাশ করেন। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদানদ্বারা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে থাকেন। এছাড়াও শান্তি, সম্প্রতি ও মানবতাবাদের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে তিনি বিভিন্ন শিল্পকর্ম গড়ে তোলেন।

ক. গ্রামের প্রধানকে কী বলা হয় ?

খ. চতুর্থ সঞ্জীতি আয়োজনের কারণ বর্ণনা কর।

গ. উথোয়াই মং মার্মীর কর্মকাণ্ডে বৌদ্ধধর্মের কোন শাসকের সঙ্গে মিল রয়েছে— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় বল প্রয়োগের পরিবর্তে ধর্ম চর্চার গুরুত্ব উথোয়াই মং মার্মীর ক্ষেত্রে কতটুকু সুস্থিস্থিত সফ্রট কণিকের কর্মকাণ্ডের আলোকে বর্ণনা কর।

২। সুদর্শী চাকমা শিল্পপতি ও জ্ঞানী লোক ছিলেন। তিনি ধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ভিক্ষুসমাজের জন্য আবাসন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। একদা খ্রিস্টানের অংশ বিশেষ বিনয়বিধি সম্পর্কে বিভ্রান্ত দেখা দেয়। এমনকি বস্তুনিষ্ঠ তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি নির্বাচন করেন এবং উক্ত পণ্ডিত বিনয় বিধির উপরে একটি গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে সে সমস্যার সমাধান করেন।

- ক. 'দেবানামপিয় উপাখ্যে কে লাভ করেছিলেন?
- খ. সম্রাট কবিন্ধ শাসন ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ করেছিলেন কেন? বর্ণনা কর।
- গ. সুদর্শী চাকমার মহৎ উদ্যোগটিতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে কোন কবির আনন্দের প্রতিফলন ঘটেছে – ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় সুদর্শী চাকমার কর্মকাণ্ডে সম্রাট কবিন্ধের সঙ্গে কতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ-যুক্তি প্রদর্শন কর।

#### শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. সম্রাট কবিন্ধ ছিলেন . . . বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি।
২. সম্রাট কবিন্ধের রাজত্ব কালেই প্রথম . . . তৈরির সূচনা হয়।
৩. অশ্বমেধ . . . হিসেবে সংগীতিতে উপস্থিত ছিলেন।
৪. প্রখ্যাত দার্শনিক . . . সভাপতিত্বে এ মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়।
৫. পালি ভাষার পরিবর্তে . . . ভাষায় মহাবিশ্বাসাশ্রয় রচিত হয়।

#### মিলকরণ :

তান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর

| বাম                         | ডান                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| ১. সম্রাট কবিন্ধ অত্যন্ত    | সৈন্যদল পরিচালনা করতেন               |
| ২. কুষা শিল্প প্রখ্যাত      | দিন সীমান্তে বাস করত                 |
| ৩. সম্রাট কবিন্ধ নিজে       | জনদরদী রাজা ছিলেন                    |
| ৪. বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রসারে | দুটি ধারায় আত্মপ্রকাশ করে           |
| ৫. ইউটি জাতি                | সম্রাট কবিন্ধ বিশেষ জুমিকা রেখেছিলেন |

#### সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. সম্রাট কবিন্ধ কীভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন?
২. সম্রাট কবিন্ধ কীরকম মৃত্যুর প্রচলন করেছিলেন?
৩. 'কবিন্ধ বিহার' কোথায়?

#### রচনামূলক প্রশ্ন :

১. কুষা বংশের পরিচয় দাও।
২. সম্রাট কবিন্ধের খ্যাতি লাভের কারণসমূহ বর্ণনা কর।
৩. কুষা শিল্প কীভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল বর্ণনা দাও।
৪. সম্রাট কবিন্ধ কেন ও কীভাবে সজীবিত অবিবেশনের আরোহণ করেছিলেন লেখ।

২০১৩  
শিক্ষাবর্ষ  
৮-বৌদ্ধধর্ম

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ কর  
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জীবসেবা পরম ধর্ম



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণ :